ক্যারিয়ার ভাবনা

ডা. শামসুল আরেফীন

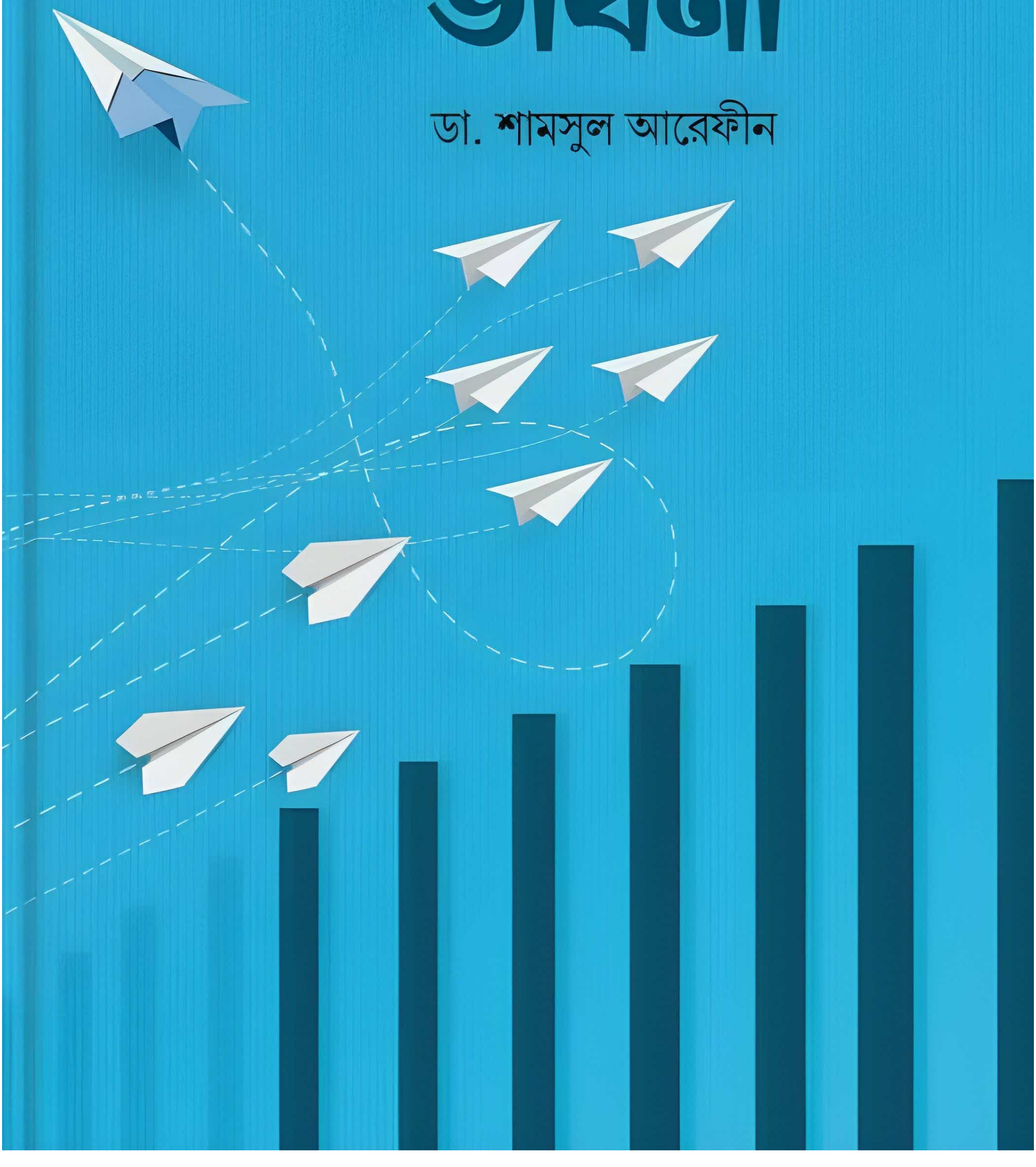

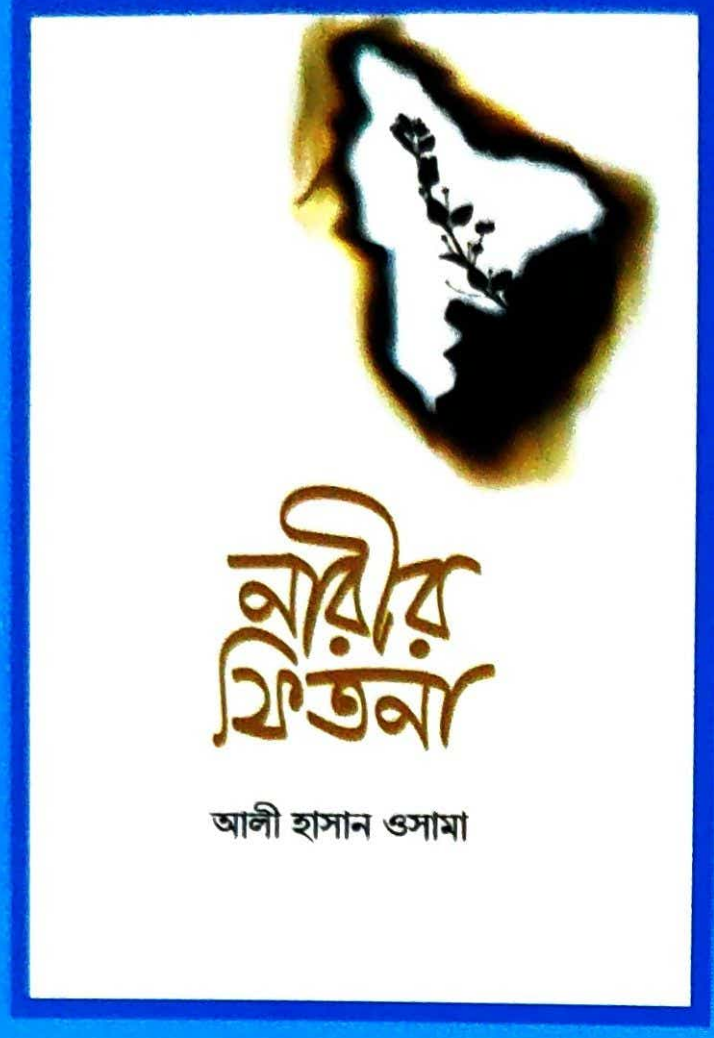
ফিতনা
আলী হাসান ওসামা

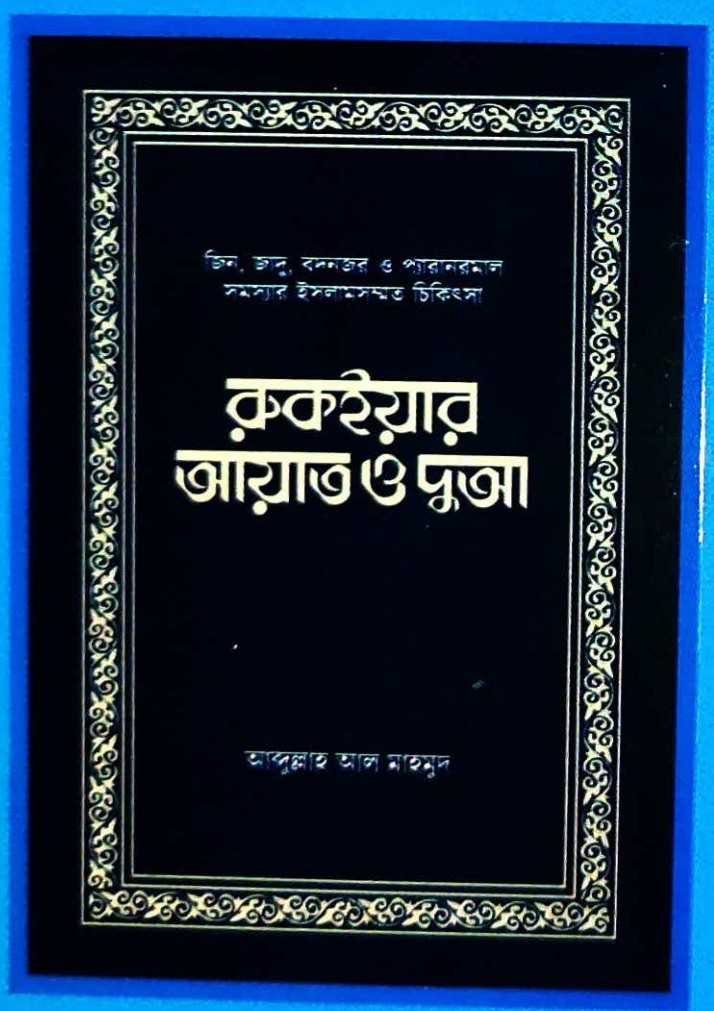
জিন, জাদু, বদনজর ও প্যারানরমাল
সমস্যার ইসলামসম্মত চিকিৎসা
রুকইয়ার
আয়াত ও দুআ
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

মুমিনের
ক্যারিয়ার ভাবনা

মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনা

ডা. শামসুল আরেফীন

শরয়ি সম্পাদনা

মুফতি আবুল হাসানাত কাসিম

চেতনা
প্রকাশন

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৩

প্রচ্ছদ

ইলিয়াস বিন মাজহার

০১৭৯৯-০৩০৮০৭

বানান ও সজ্জা

সাহিত্যসারথি (ssa.pyhood.com)

চেতনা প্রকাশন

দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৭৯৮৯৪৭৬৫৭

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

মূল্য : ২৪০.০০৳

Muminer Career Bhabona by Dr. Shamsul Arefin
Published by Explain Publication
e-mail : explainpub@gmail.com
website : explain@chetonaprokashon.com

উৎসর্গ

আমার আব্বু মুহতারাম।

যিনি প্রতিদিন আমাকে টায় টায় হিসেব করে হাতখরচ দিতেন। নষ্ট এই পৃথিবীতে আমি যেন নষ্ট না হই, সেজন্য কোনোকিছু করতে তিনি বাদ রাখেননি।

যেভাবে তিনি আমার পেছনে সাধ্যমতো সময়-যত্ন-ইহসান দিয়েছেন, মহান রহমানও যেন তাঁকে তাঁর শান মোতাবেক ইহসান করেন। আমিন।

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়

আরিফুল ইসলাম
ইসমাঈল যাবিহুল্লাহ
বিন-ইয়ামিন সানিম

আল্লাহ তাআলা আপনাদের খেদমতগুলো কবুল করুন।

-প্রকাশক

সূচিপত্র

ভূমিকা		৯
ক্যারিয়ার কী?		১৩
পুঁজিবাদ		১৫
ইসলামে রিজিকের ধারণা		২৬
»	রিজিক শুধু বস্তুগত বিষয় নয়	২৮
»	যে রাস্তাগুলো দিয়ে রিজিক আল্লাহ পৌঁছান	৩১
»	রিজিক অপরিবর্তনীয়	৩৫
»	বস্তুগত জীবিকা উপার্জনের বিধান	৩৮
»	কতটুকু উপার্জন ফরজ	৪০
»	নবিদের (আলাইহিমুস সালাম) জীবিকা	৪৩
»	নবিজি সা.-এর জীবিকা	৪৫
»	সাহাবিদের জীবিকা	৪৬
»	সাহাবিদের জীবনযাপনের ধরন	৪৯
»	সঞ্চয়	৫১
»	সঞ্চয় ও অতিরিক্ত আয়ের প্রয়োজনীয়তা	৫২
দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি : ইসলামের মূল বার্তা		৫৫
»	দুনিয়া বনাম হায়াতুদ-দুনিয়া	৬১
»	ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থা	৬৪
পুঁজি বনাম পুঁজিবাদ		৭০
»	ক্যারিয়ার বনাম ক্যারিয়ারিজম	৭৫
ইসলামে সম্মানের ধারণা		৭৭
ব্যবসা		৮৬
বোনদের ক্যারিয়ার		৯১
»	ভিক্টোরিয়ান যুগে নারী (১৮৩৭-১৯০১ খ্রি.)	৯৪
নারীর ক্যারিয়ারিজম		৯৯
পড়তে যেহেতু হচ্ছেই		১৩৩
শেষ কথা		১৪৩

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াস-সালাতু ওয়াস-সালামু আলা সাইয়িদিল আম্বিয়ায়ি ওয়াল-মুরসালিন। ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন।

প্রথমত, আমাদের বইয়ের নাম 'মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনা'। মানে, সাধারণত বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে দেখবেন যে, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং হয়, বিভিন্ন জব অপরচুনিটি নিয়ে কাউন্সেলিং হয়। 'তুমিও জিতবে', 'সময়কে কাজে লাগান' এই জাতীয় কথা বলা হয়। জীবনে উন্নতি করার, নিজেকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার মোটিভেশন দেওয়া হয়। এই বইয়ে আমরা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্যারিয়ার ভাবনার দিকে তাকাব।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে 'ধর্ম' নয়, ইসলাম হলো 'দ্বীন'—জীবনব্যবস্থাপনা, Life Management System.[১] সুতরাং আবশ্যিকভাবেই ইসলামে জীবিকা-ক্যারিয়ার-সম্মান বিষয়ে কোনো না কোনো নীতিমালা দেওয়া থাকবে। আমরা দেখব আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জীবিকা ও ক্যারিয়ারের ব্যাপারে কী বলতে চেয়েছেন। একজন মুমিন, যিনি কালিমা পড়েছেন, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللهِ-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ; এই কালিমা পড়ার পরে তার ক্যারিয়ার-ভাবনাটা কেমন হবে? আমরা তো সবাই মুসলিম। আমরা আল্লাহ তাআলার ওপরে ঈমান এনেছি; ঈমানের যে বিষয়গুলো রয়েছে, যেমন, আল্লাহর ওপরে, রাসুলের ওপরে, (আসমানি) কিতাবসমূহ ও আখেরাতের জীবনের ওপরে আমরা ঈমান এনেছি। এখন এই ঈমানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ক্যারিয়ারটা কেমন হওয়া উচিত?

---

[১] সহিহ বুখারিতে আমরা দেখতে পাই, 'দ্বীন'-এর অর্থ ব্যাখ্যা করতে সাহাবিদের থেকে 'মিনহাজ' এবং 'শিরাআ' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর মিনহাজ অর্থ হলো, পদ্ধতি, সিস্টেম ইত্যাদি। [সহিহ বুখারি, পৃষ্ঠা ১১]—শরয়ি সম্পাদক

এজন্য সবার আগে আমরা একবার কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করব, ইনশাআল্লাহ—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহ'। একবার কালিমাও পড়ে নিই, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।'

ইসলাম শব্দের অর্থ, আত্মসমর্পণ করা, সাবমিশন অব উইল; মানে, আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। এখানে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমি যে কালিমাটি পাঠ করলাম, এই কালিমার সামনে আমি আত্মসমর্পণ করেছি কি না। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া আর এর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাঝে পার্থক্য আছে।

'ইলাহ' শব্দের তো অনেক অর্থ রয়েছে। ইলাহ শব্দের এক অর্থ তো হলো, আমি যার জন্য ইবাদত করছি, যার জন্য উপাসনা করছি, তিনি আমার ইলাহ। কিন্তু এ ছাড়াও অনেকগুলো অর্থ রয়েছে। এর মধ্য থেকে একটি হলো—

- সর্বোচ্চ ভালো যাকে বাসা যায়, যার চেয়ে বেশি ভালো আর কাউকে বাসা যায় না।

- সর্বোচ্চ আনুগত্য যার করা যায়, যার ওপরে আর কোনো আনুগত্য হয় না। না কোনো গুরুর, কোনো উস্তাজের, কোনো রাষ্ট্রের, বা মতাদর্শের—কারও আনুগত্যই এর ওপরে হয় না।

ইলাহ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, যাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভয় করা যায় বা ভয় করতে হয়। মোদ্দাকথা, সর্বোচ্চ ভালোবাসা, আনুগত্য ও ভয় যার প্রতি হয়, যার প্রতি হতে হয়, তিনিই হচ্ছেন ইলাহ।

ছোটবেলা থেকে এই পর্যন্ত আমরা পড়াশোনা করে এসেছি স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোটবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে, বিভিন্ন কো-কারিকুলার এক্টিভিটিজের মাধ্যমে (যেমন গান-নাচ-ডিবেইট), টিভি-চ্যানেল, নাটক, সিনেমা, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন চিন্তাধারা-মতাদর্শকে আমাদের মন-মগজে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। ইসলামের আদর্শ-দৃষ্টিভঙ্গি

এবং এই আমার ভেতরে ইনপুট দেওয়া আদর্শ এক তো নয়ই, ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত। যার কারণে ইসলামের অনেক বিষয়ই আমার কাছে কষ্টকর মনে হয়। ফলে মুখে মুসলিম দাবি করলেও আত্মসমর্পণটা ঠিক হয়ে ওঠে না। আত্মসমর্পণ হচ্ছে—

- আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কিতাব কুরআনে মাজিদে যে বিধানগুলো পাঠিয়েছেন,
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ দিয়ে আমাদের সামনে সেই কুরআন ব্যাখ্যা করেছেন এবং
- সেই ব্যাখ্যাকে সাহাবায়ে কেরাম রা. ধারণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
- এরপর সেই প্রজন্ম তাঁদের পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।
- এভাবে প্রত্যেক প্রজন্ম তাদের পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

তার কাছে নিজের খেয়ালখুশিকে সঁপে দেওয়া। এটিই হচ্ছে ইসলাম। অর্থাৎ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে যা পেয়েছেন এবং সাহাবিদেরকে সেটির যে ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন, তা-ই ইসলাম এবং এই ইসলামের কাছেই আমি আত্মসমর্পণ করলাম।...

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জন্য আল্লাহর কিতাব। আর 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'র জন্য রাসুলের সুন্নাহ। এবং আমাদের পরিচয় 'আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ'।[২] অর্থাৎ, আমরা রাসুলের সুন্নাহর অনুসরণ করি এবং সাহাবায়ে

---

[২] যেমন মুতাজিলা সম্প্রদায় নিজেদের পরিচয় দিত 'আহলুল আদল ওয়াল-আকল'। শিয়ারা ভিন্ন পরিচয় দেয় নিজেদের আহলে বাইতের সাথে সম্পর্কিত করে। মূলত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' পরিচয়টি এসেছে রাসুলের হাদিস থেকে। রাসুল বলেন, 'তোমরা **আমার সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহকে** আঁকড়ে ধরো।' [সুনানু আবি দাউদ : ৪৬০৭; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২; হাদিসটি সহিহ]

তিনি আরও বলেন, 'তোমরা জামাতকে আঁকড়ে ধরো। অর্থাৎ **সাহাবা ও মুসলিমদের জামাতের সাথে একমত ও ঐক্যবদ্ধ থাকো**; বিচ্ছিন্নতাবাদী হয়ো না।' [সুনানুত তিরমিজি : ২১৬৫; মুসনাদু আহমাদ : ২৩১৪৫; হাদিসটি সহিহ]

উপরিউক্ত দুটি হাদিসে সুন্নাহ ও জামাতকে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। অতএব যুগে যুগে যারা এই দুটিকে সঠিকভাবে ধারণ করেছে এবং করে, তারাই মূলত 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ' তথা সুন্নত ও জামাতের ধারক।

কেরামের জামাত যা বুঝেছেন, তার অনুসরণ করি।

তাই, সবার আগে এই বিষয়টি আমি আপনাদের সামনে স্পষ্ট করলাম যে, আসলে আমাদের আত্মসমর্পণটা হয়ে ওঠে না। ছোটবেলা থেকে আমরা যেভাবে বড় হয়েছি, যে ধ্যানধারণা, যে পরিবেশ আমাদের মনের মধ্যে চেপে বসেছে, সেটাকে 'সমর্পণ' করতে হবে। অস্ত্র সমর্পণের মতো। কীসের সামনে? আল্লাহ তাআলার কিতাব ও রাসুলুল্লাহর সুন্নাহর সামনে, সাহাবায়ে কেরামের বুঝের সামনে। তাহলেই আমি ভালোভাবে মুসলিম হতে পারলাম। আমার এতদিনের লালিত ধ্যানধারণা, এতকাল ধরে বেড়ে ওঠা আমার ব্যক্তিগত বুঝ, মতাদর্শ, বাছবিচার... সবকিছুকে আমি আল্লাহর সামনে ফেলে দিলাম, সমর্পণ করলাম। আত্মসমর্পণ করলাম যে, ও আল্লাহ! আমার খুশি নয়, বরং আপনার খুশি। আমার মর্যাদা নয়, বরং আপনার মর্যাদা। আমার আদেশ নয়, আপনার আদেশ। আমার নিষেধ নয়, আপনার নিষেধ। আমার জ্ঞান-বুঝ না, বরং আপনার জ্ঞানের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম। এই হচ্ছে মুমিনের ঈমান। আমরা এখন মুমিন। মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনাটি কী হবে, সে বিষয়ে আমাদের আজকের আলোচনা। বিসমিল্লাহ বলে আমরা শুরু করছি।

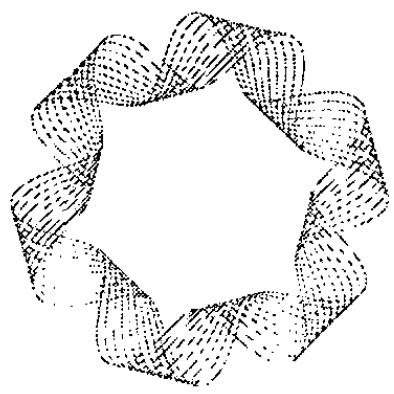

মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনা : ১২

ক্যারিয়ার কী?

সবার আগে ক্যারিয়ার মানে কী, সেটা স্পষ্ট হওয়া দরকার। বিভিন্ন অভিধান থেকে এ শব্দটির অর্থগুলো যেভাবে এসেছে—

- **a profession, occupation** (পেশা), **trade** (ব্যবসা) **or vocation.** (কর্ম বা বৃত্তি, যার মাধ্যমে মানুষ আয়-উপার্জন করে।)

- the progress and actions you have taken throughout the working years of your life, especially as they relate to your occupation. (আমি কর্মজীবনে যে উন্নতি করলাম, পুরো কর্মজীবনজুড়ে আমার যে প্রমোশন হচ্ছে ক্রমান্বয়ে, একেই বলা হচ্ছে ক্যারিয়ার।)

- the job or series of jobs that you do during your working life, especially if you continue to **get better jobs** and **earn more money.** (যেমন, কেউ একটি চাকরি ছেড়ে আরও ভালো কোনো চাকরি করছে; কেউ একটি স্তরের স্যালারি ছেড়ে আরও উচ্চস্তরের স্যালারির কাজে যাচ্ছে, এ বিষয়টিকেই তারা বলছেন 'ক্যারিয়ার'।)

- doing something **regularly for most of your life** (কর্মজীবনে আমি যে কাজগুলো করি অর্থ উপার্জনের জন্য), especially as your **main way of making money.** (নিয়মিত কোনো একটি কাজ করা, জীবনের অধিকাংশ সময় যার পেছনে ব্যয় হয়। অর্থাৎ, এমন একটি কাজ, দিনের বেশি সময় ধরে আমি যা করি, বা, জীবনের বড় একটা সময়জুড়ে টাকা বা জীবিকা উপার্জনের প্রধান মাধ্যম হিসেবে আমি যা অবলম্বন করি, তা-ই 'ক্যারিয়ার'।)

আমরা এখানে চারটি সংজ্ঞা থেকে দুটো জিনিস পাই—

১. ক্যারিয়ার হলো টাকা উপার্জনের মাধ্যম।

২. এটি একটি উন্নতি ও সামাজিক সম্মানের বিষয়। বা, কর্মজীবনের শেষে আয়নার সামনে আমি নিজেকে যেখানে দেখতে চাই, আত্মমর্যাদা, আত্মতুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির যে জায়গায় আমি নিজেকে দেখতে চাই, সেটিই হলো ক্যারিয়ারের মূল লক্ষ্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্যারিয়ারের মূল লক্ষ্য দুটি—

এক. টাকা উপার্জন করা।

দুই. নিজের উন্নতি ও আত্মমর্যাদা অর্জন করা।

মানে, ক্যারিয়ারের টাকা ও সম্মান অর্জনের সঙ্গে এখানে আরেকটি বিষয়ও কাজ করে, 'ওপরে ওঠার প্রবণতা'; আরও ওপরে উঠব, তো আরও বেশি টাকা, আরও বেশি সম্মান। এটাকে আমরা বলব 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা', 'পার্থিব প্রতিযোগিতা'।

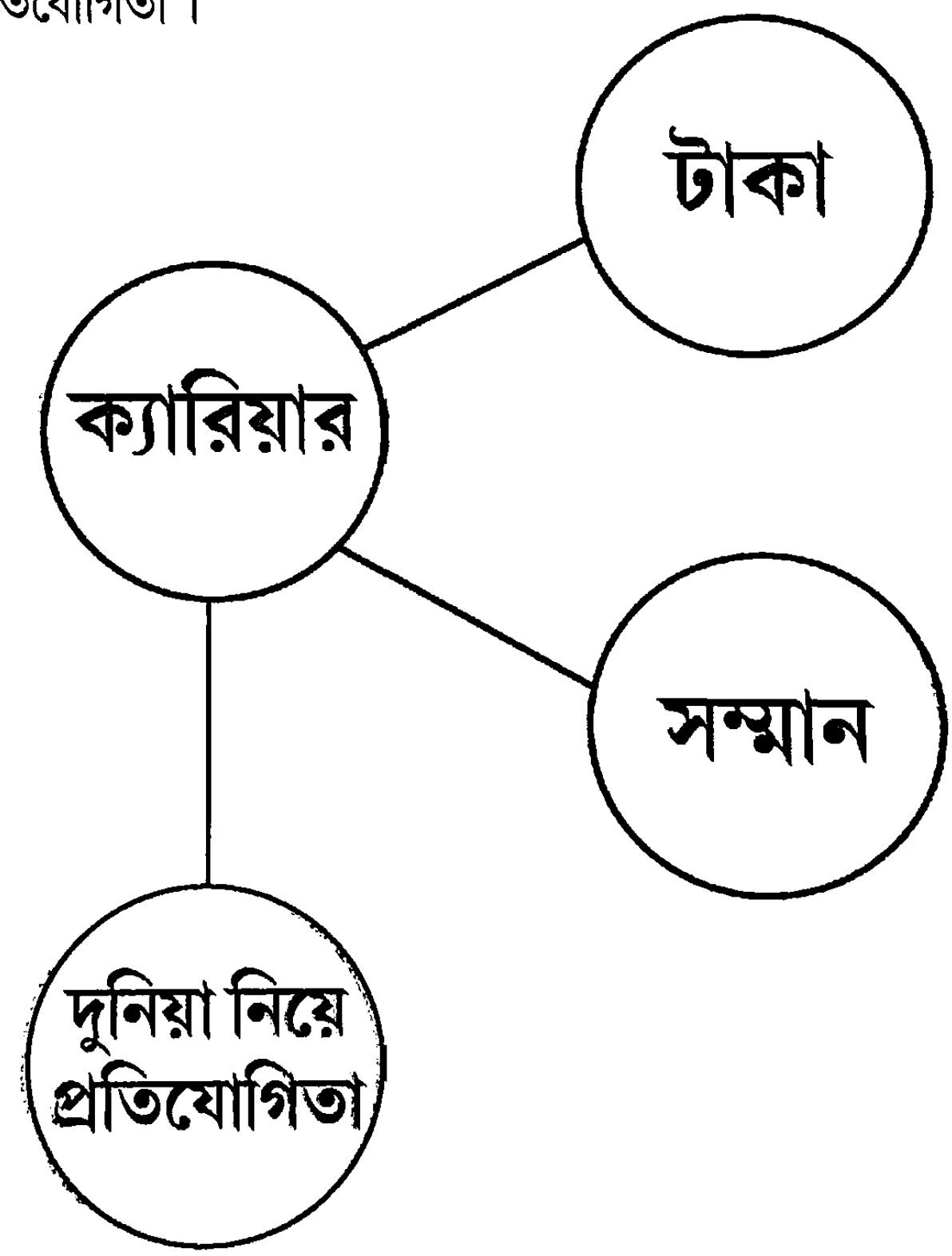

পুঁজিবাদ

টাকা উপার্জনের সঙ্গে যে সম্মানের একটা সম্পর্ক, এ বিষয়টি (বা ধারণাটি) দুনিয়ায় কবে থেকে শুরু হলো? মাছ জন্মায় পানিতে। পানি তার জন্য স্বাভাবিক বিষয়। সে ভাবে, সারা দুনিয়া বুঝি পানিই। আমরা যে পরিবেশে বড় হই, মনে করি, সব যুগে বুঝি এমনই ছিল; পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে সবকিছু বোধ হয় এরকমই ছিল।

জন্মের পর থেকেই আমরা দেখেছি, দোকানে গিয়ে এক টুকরো কাগজ দিলে, একটি চকলেট পাওয়া যায়। কাগজের নোটের বিনিময়ে পণ্য পাওয়া যায়—এর বাইরে অন্য কোনো সিস্টেম আমরা দেখিনি। জন্মের পর থেকে আমরা দেখে আসছি, প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভোট হয়ে কেউ একজন ক্ষমতায় আসে। পাঁচ বছর পরে আবার একটা ভোট হয়, আবার নতুন একটি সরকার গঠিত হয়। আমাদের কাছে মনে হয়, এই পদ্ধতিই বুঝি শ্রেষ্ঠ, এটিই ধ্রুব; এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না; পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে হয়তো এমনই ছিল; এটিই স্বাভাবিক। অর্থাৎ, বাতাসের মধ্যে থাকতে থাকতে আমাদের কাছে বাতাস যেমন স্বাভাবিক হয়ে যায়, আমরা আলাদা কিছু অনুভব করতে পারি না, ঠিক একইভাবে, এ বিষয়গুলোও আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

ঠিক তেমনইভাবে ছোটবেলা থেকে যে ধ্যানধারণা আমরা শিখে এসেছি—'পড়ালেখা করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে', 'তোমাকে অনেক বড় হতে হবে, বড় ডাক্তার হতে হবে, বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে'। **এভাবেই টাকার ভিত্তিতে সম্মান নির্ধারিত হওয়ার চিন্তা নিয়ে আমরা বড় হই। কিন্তু ব্যাপারটি এমন নয়। পৃথিবীর একটি ইতিহাস আছে। পৃথিবী চিরকাল এমন ছিল না; পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে গেছে, পৃথিবী বদলে গেছে।** মানুষ বদলে গেছে; মানুষের মন-চিন্তা-চেতনা, হাসি-খুশি-স্বপ্ন সবকিছু বদলে গেছে। কীভাবে বদলে গেছে, তা

দীর্ঘ আলোচনার বিষয়[৩]—পৃথিবী একটা সময় কেমন ছিল, আর আজকের পৃথিবী কেমন হয়ে গেছে।

যে অর্থনীতি বুঝল, সে পৃথিবীকে বুঝল। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফাসফেল্ডের একটি বিখ্যাত বই আছে, যেটির বাংলা হচ্ছে 'অর্থনীতিবিদদের যুগ'। এই বইয়ে লেখক বলছেন :

> "ষোড়শ শতকে এই নতুন শিশু অর্থনীতি (পুঁজিবাদ) থেকে জন্ম নিল নতুন মনোভাব—বাজার-মানসিকতা, যার মূল্যবোধগুলো ভিন্ন ধরনের।... ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অন্য সবার চেয়ে ওপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা। ভ্রাতৃভাবের চেয়ে প্রতিযোগিতাই দরকারি মানসিকতা এই নতুন ব্যবস্থাতে।... ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হতে লাগল।..."

মানে, ১৫০১-১৫৯৯, এই সময়ে মানুষের মধ্যে এক নতুন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা উদয় হয়েছে, যা মানুষের মূল মানসিকতাকে প্রভাবিত করেছে। সেই নতুন ব্যবস্থা বা মানসিকতাটা কী? তিনি বলছেন, সেটা হলো 'বাজার-মানসিকতা'। যার মূল্যবোধগুলো, মানে নৈতিকতাগুলো ভিন্ন ধরনের। হালাল-হারাম, বৈধ-অবৈধগুলো ভিন্ন, এতদিন যা ছিল, তেমন না। এতদিন নৈতিকতা ছিল ধর্মভিত্তিক। ধর্মের শিক্ষা ছিল, আর্থিকভাবেও প্রত্যেকে অপরের জন্য দায়ী। সমাজে একজন নারী ক্ষুধার জন্য নিজের ইজ্জতকে বিক্রি করছে, এর জন্য পুরো সমাজই দায়ী হবে। পুরো সমাজের কেউ কেন তাকে সহযোগিতা করেনি যে, সে ক্ষুধা নিবারণের আহার জোগাতে এমন একটা জঘন্য কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা কিন্তু ইসলামেও আছে; ইসলামে জাকাত, সদকার ব্যবস্থা রয়েছে গরিবের জন্য। এমনকি, রাষ্ট্রের জরুরি প্রয়োজনে খলিফা চাইলে ধনীদের ওপর আলাদা ট্যাক্স আরোপ করতে পারেন। সামাজিক নৈতিকতার বিষয়ে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের নৈতিক নির্দেশনা, মূল্যবোধ, সামাজিক বন্ধনগুলো কাছাকাছি ধরনেরই।

কিন্তু নতুন জন্ম নেওয়া মানসিকতার মূল্যবোধ কেমন? বলা হচ্ছে, বিপরীতে নতুন এই মানসিকতায় সাফল্য লাভের জন্য প্রয়োজন অন্য সবার চেয়ে ওপরে ওঠা, অপরকে পিছে ফেলা আর টেক্কা দেওয়ার প্রচেষ্টা। অর্থাৎ, নতুন

[৩] লেখকের লিখিত 'অবাধ্যতার ইতিহাস' বইটি দেখতে পারেন।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে মানুষের মানসিকতা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, তাতে প্রতিযোগিতা আর স্বার্থবাদিতার প্রবণতা প্রাধান্য পাচ্ছে। আরেকজনের কী হলো, তা দেখার বিষয় নয়; অপরের জন্য স্যাক্রিফাইস করা বলতে সেখানে কিছু নেই; বরং আরেকজনকে পেছনে ফেলতে হবে, টেক্কা দিতে হবে।

এরপর ড্যানিয়েল ফ্যাসফেল্ড বলছেন, "...ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হতে লাগল।" অর্থাৎ, একটা সময় পর্যন্ত মানুষের মর্যাদাটা টাকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না; বরং এই মর্যাদা সম্পর্কযুক্ত ছিল তার জ্ঞান, আচারব্যবহার, গরিবের প্রতি দরদি মানসিকতার সঙ্গে; এগুলো দ্বারা মানুষ সম্মানিত হতো। অতিথিপরায়ণতার দ্বারা মানুষ সম্মানিত হতো। তা ছাড়া, বীরত্ব ও নেতৃত্ব দ্বারাও সম্মানিত হতো। যেমন আমরা দেখি, আবু সুফিয়ান জাহিলি যুগেও নেতৃত্বের কারণে সম্মানিত ছিলেন। অর্থাৎ, সামাজিক নানারকম ভূমিকায় মানুষ সম্মানিত হতো। কিন্তু ষোড়শ শতকে যে একটা নতুন মানসিকতা আমরা দেখতে পাচ্ছি, অধিক লাভ করা, মুনাফা করা। কীভাবে অধিক মুনাফা করছি, তা দেখার বিষয় নয়; বরং লাভ করা দরকার, বেশি বেশি ভোগ করা দরকার। এই যে একটা মানসিকতা, এই মানসিকতা থেকেই 'সম্পদ সংগ্রহ দ্বারা মানুষের বিচার হতে থাকল'; অর্থাৎ, টাকা যে যত কামাবে, তার সম্মান তত বেশি; সম্মান বিষয়টিকে টাকার সঙ্গে যুক্ত করে ফেলা হলো। কিন্তু একটা সময় এমনটা ছিল না। তাই আমরা বলতে চাই, এটা আমাদের প্রকৃতিজাত পদ্ধতি নয়; মানুষের ফিতরাতের সঙ্গে এ পদ্ধতিটা যায় না। বরং এটা আমাদেরকে নতুন করে শেখানো হয়েছে, আমাদেরকে এতে প্রভাবিত করা হয়েছে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

এখানে আমরা প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার কথা বলতে পারি। Encyclopedia Britannica বলছে—

The new social and economic changes (এনলাইটেনমেন্ট)[৪] also called upon the schools (public and private) to broaden their aims and curricula. Schools were expected not only to promote literacy, mental discipline, and good moral character (শিক্ষার আগের উদ্দেশ্য) but also to help prepare children for citizenship, for jobs, and for individual development and success. (পরের উদ্দেশ্য)

অর্থাৎ, নতুন চিন্তা-মানসিকতা আসার পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক একটা চেঞ্জ এসেছে। এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, লিখতে-পড়তে পারা (promote literacy), শৃঙ্খলা শেখানো (mental discipline)। জীবনে কীভাবে চলতে হবে—সেগুলো শেখানো। আর নৈতিক চরিত্র (good moral character) গঠন করা। কিন্তু সমাজে নতুন যে পরিবর্তন এলো, তাতে এখন শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্ন হয়ে গেল। এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল—

১.

নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি (citizenship)। মানে, ইউরোপে নতুন সোশ্যাল ও ইকোনমিক চেঞ্জ আসার পরে (যাকে এনলাইটেনমেন্ট বলা হয়) শিক্ষার উদ্দেশ্য পালটে গেল। এনলাইটেনমেন্ট চিন্তাধারার মূল বিষয়গুলো হলো, ধর্মকে পাবলিক লাইফ থেকে, জনপরিসর থেকে দূরে সরিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে আবদ্ধ করে রাখা। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকবে, এটা রাষ্ট্রে থাকবে না, সমাজে থাকবে না, অর্থব্যবস্থায়ও থাকবে না। এরকম কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় এনলাইটেনমেন্ট যুগের পর। এই যুগের আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য যা ছিল, এই যুগের পর তা পরিবর্তিত হয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়ে গেল,

[৪] Enlightenment হলো সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন। এর ফলে ঈশ্বর, যুক্তি, প্রকৃতি এবং মানবতার ধারণা নতুনভাবে তৈরি হয়; যার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে এক নতুন worldview বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পশ্চিমে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং শিল্প-দর্শন-রাজনীতির ছাঁচ গড়ে দেয়। এই চিন্তাধারার কেন্দ্র হচ্ছে—যুক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের মূল লক্ষ্য এখানে—জ্ঞান, স্বাধীনতা আর সুখ।

ফ্রান্সে Voltaire, D'Alembert, Diderot, Montesquieu;

স্কটল্যান্ডে Frances Hutcheson, Adam Smith, David Hume, Thomas Reid;

জার্মানিতে Christian Wolff, Moses Mendelssohn, G.E. Lessing, Immanuel Kant প্রমুখ। এঁদের চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল আরও আগের Hobbes, Locke, Descartes, Bayle, Leibniz, Spinoza-দের চিন্তাকে ঘিরে। [plato.stanford.edu]

ধর্মকে বাদ দিয়ে নতুন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি হলো, সেটার জন্য উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা, যে ওই ধর্মহীন ব্যবস্থার জন্য কাজ করবে।

২.

নতুন অর্থব্যবস্থার (পুঁজিবাদী) জন্য কর্মী তৈরি করা, যারা চাকুরিতে (jobs) আসবে। চাকুরি করে এই নতুন অর্থব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবে।

৩.

নতুন সংজ্ঞার 'ব্যক্তি' তৈরি (individual development) করা। মানে, আপনি 'ব্যক্তি' (individual/human person) হতে পারবেন তখন, যখন আপনি পূর্ববর্তী যুগের ধর্মীয় ধ্যানধারণা-বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবেন। এগুলোকে বাদ দিয়ে নিজের যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে যখন আপনি চিন্তা করতে শিখবেন, ভালো-মন্দ সবকিছু ধর্ম থেকে নয় বরং নিজেই ঠিক করতে শিখবেন, তখন আপনি 'ব্যক্তি' হতে পারবেন।[৫]

দর্শনের আলাপ

'ইনডিভিজুয়াল', 'হিউম্যান', 'পারসন'—এগুলো মূলত দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা। এনলাইটেনমেন্ট যুগে নতুনভাবে যে দর্শন দেওয়া হচ্ছে, নতুনভাবে যে দৃষ্টিভঙ্গি আনা হচ্ছে, সেখানে বলা হচ্ছে, জীবনে আদর্শ 'ব্যক্তি' হতে হলে, ধর্মকে ত্যাগ করতে হবে, বা, কম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে রাখতে হবে। এখানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়াটা সফলতা নয়, বরং দুনিয়ায় সর্বোচ্চ পরিমাণে ভোগবিলাস করতে পারাটাই হচ্ছে সফলতা।

ষোড়শ শতকে ইউরোপে যারা দার্শনিক ছিলেন, তারা বলছেন যে, 'হিউম্যান পারসন' আপনি তখনই হবেন, যখন আপনি আগের ধর্মীয় নীতিনৈতিকতা,

---

[৫] 'ব্যক্তি'র (human person) প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো স্বাধীনতা। প্রাণিসত্তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তিসত্তায় যাবার রাস্তা হলো 'পরিপূর্ণ স্বাধীনতা'। [Jean-Paul Sartre, L'Être et le Néant] একজন লোক 'ব্যক্তি' হতে পারবে, যখন সে নিজের স্বাধীন সিদ্ধান্ত চর্চা করবে। স্বাধীনভাবে নিজের জীবনকে গড়ে নেবে এবং জীবন কীভাবে চালাবে সে নির্দেশনা নিজেই স্বাধীনভাবে দেবে। [Kierkegaard] সে-ই স্বাধীন 'ব্যক্তি' যে নৈতিকতার স্রষ্টা, নিজের নৈতিকতা নিজেই ঠিক করে (creator of values)। স্বাধীন ব্যক্তি আগের কোনো মূল্যবোধকে মেনে নেয় না। সে মূল্যবোধ-নৈতিকতা নিজে ঠিক করে। [Frederick C. Copleston; The Human Person in Contemporary Philosophy, PHILOSOPHY, Vol. 25, No. 92 (Jan. 1950), pp. 3-19]

ধর্মের ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম (বৈধ-অবৈধ) ইত্যাদিকে পাশে রেখে নিজের ভালো-মন্দ, নিজের বৈধ-অবৈধ নিজেই ঠিক করতে পারবেন। এ-ও বলা হচ্ছে যে, আপনি যখন এমন 'ব্যক্তি' হলেন, তখন আপনার সফলতা আর ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়; বরং তা এই ইহলৌকিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। এখানকার সফলতাই আপনার সফলতা। আপনি যখন ধর্মের বন্ধন থেকে স্বাধীন হতে পারবেন, নিজের ভালো-মন্দ যখন নিজেই ঠিক করতে পারবেন এবং এর মাধ্যমে যখন এই দুনিয়ায় সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারবেন, তখনই আপনি একজন সফল মানুষ।[৬] অর্থাৎ, আপনার সফলতার মাপকাঠি পরিবর্তন হয়ে গেল। আগে সফলতার মাপকাঠি ছিল, আমি যদি নীতিনৈতিকতায় ভালো হতে পারি, আচার-আচরণে ভালো হতে পারি এবং এর ফলে পরকালে মুক্তি পেতে পারি, তাহলে আমি সফল। এখন এনলাইটেনমেন্ট পিরিয়ডে এসে তারা বলছে যে, না, আপনি সফল হবেন, যদি আপনি দুনিয়ার জীবনে সর্বোচ্চ ভোগ করে যেতে পারেন, পিতার চেয়ে আরও ওপরের স্তরের ভোক্তা হতে পারেন।

মোটকথা, শিক্ষার আগের উদ্দেশ্য আর এখনকার উদ্দেশ্যের মধ্যে তফাৎ এসে গেছে। এখনকার শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো—

- যোগ্য নাগরিক তৈরি, যারা নতুন ধর্মহীন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবে।
- যোগ্য কর্মী তৈরি, যারা নতুন ধর্মহীন অর্থব্যবস্থার জন্য কাজ করবে।
- এবং এমন ব্যক্তি তৈরি, যারা সফলতার নতুন ধর্মহীন সংজ্ঞার জন্য প্রস্তুত হবে।

এই তিনটি হলো নতুন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এই যে আমরা মাঝে মাঝে বলি, ধর্মশিক্ষাকে কেন বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কেন ইসলাম শিক্ষার পাবলিক পরীক্ষা হবে না, কেন ইসলাম শিক্ষার সঙ্গে আবার নৈতিক শিক্ষা যোগ করা হলো? এগুলো কিন্তু ওই নতুন শিক্ষাব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি—ধর্মহীন সেক্যুলার শিক্ষা। শিক্ষার কথা বললাম কারণ, শিক্ষাটা আমাদের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

তাহলে, এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, টাকার

---

[৬] জীবনের লক্ষ্য হলো সর্বাধিক সুখ চরিতার্থ করা (ভোগ) এবং সর্বনিম্ন কষ্ট পাওয়া (maximizing pleasure and minimizing pain)। [hedonistic principle, John Locke]

ভিত্তিতে সম্মান—এই ব্যাপারটা/ধারণাটা শুরু হয় ষোড়শ শতক থেকে। একইভাবে, পড়াশোনার লক্ষ্য যে শুধু চাকরি করা, এই চিন্তাভাবনাও সে সময়কাল থেকে শুরু হয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এটার উৎপত্তি হয় ইউরোপে। আর এই ইউরোপীয় ধারণাটা আমাদের দেশে আমদানি হয় ব্রিটিশরা এ দেশ দখল করার পর। তারা শুধু আমাদের দেশই নয়, বরং পুরো মুসলিমবিশ্বকে তারা একসময়ে নিজেদের দখলাধীন করে ফেলেছিল। সে সময়েই তারা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপীয় চিন্তা-দর্শনগুলো মুসলিমবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

আমরা দেখতে পেলাম, সমস্ত সংজ্ঞাই বদলে গেছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে। মানুষের পুরো জীবনদর্শনই বদলে গেল। একটা সময়ে যেমন জীবনদর্শন ছিল ধর্মমুখী; খ্রিষ্টধর্মও (তথা, খ্রিষ্টানরাও) ধর্মমুখীই ছিল; তাদের কাছে ধর্মীয় নীতিনৈতিকতার একটা আবেদন ছিল, একটা জায়গা ছিল; এখন আর সেটা নেই। তাহলে আমরা পুরো ব্যাপারটায় ছোট করে একটু নজর বুলিয়ে আসতে পারি। ইউরোপ কীভাবে বদলে গেল, এটা বুঝলেই আমরা কীভাবে বদলে গেলাম, তা বোঝা যাবে।

রেনেসাঁসের সময়েই (১৪৫৩-১৫২৭ সাল) প্রথম বলা হলো :

> এই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজেই; কোনো গড, জেসাস বা ঈশ্বর নয়।

মানুষের জ্ঞান, মানুষের অর্জন ও মানুষের জীবনই সত্য; এর ওপরে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তারা বলছেন, "বিশ্বাসের অনুতাপে পুড়ে (অনুশোচনা-তওবা ইত্যাদির মাধ্যমে) নাজাতের মাঝে কোনো মর্যাদা নেই (খ্রিষ্টবাদের চেতনা), বরং সংগ্রাম ও প্রকৃতিকে জয় করার মধ্যেই মানুষের মর্যাদা।"

দেখুন, কীভাবে তারা সে সময়ে ধর্মকে অস্বীকার করেছে। সে সময়ে ওই লোকেরা তো খ্রিষ্টান ধর্মকে ডিনাই করেছে; কিন্তু যখন এটা মুসলিম ভূখণ্ডে এসেছে, তখন আমরা এর উসিলায় ইসলামকে ডিনাই করতে শুরু করেছি। তারা বলেছে, "দুনিয়ার সব কাজকর্মের কেন্দ্রবস্তু মানুষ নিজেই।" আমরাও কিন্তু একই কাজ করেছি। আমরা রাষ্ট্র থেকে 'আল্লাহ'-কে বিদায় করেছি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সমাজ থেকে 'আল্লাহ'-কে বিদায় করেছি। ক্যারিয়ার, ব্যবসাবাণিজ্যের মধ্যে হালাল-হারামের কোনো বাছবিচার নেই। আজান হচ্ছে, কিন্তু দোকানি নামাজে যাচ্ছে না। কারণ, তার জীবনে 'আল্লাহ'র

তেমন কোনো মূল্য বা গুরুত্ব নেই। বিচারব্যবস্থায় কুরআনের কোনো হুকুম নেই; কারণ, আমরা 'আল্লাহ'-কে বিদায় করে দিয়েছি। কথাগুলো যতই খারাপ লাগুক, কিন্তু বাস্তব সত্য। অর্থাৎ, এ বিষয়টা আমাদের ভূখণ্ডে আসার পর আমরা হুবহু ইউরোপীয়দের মতোই আচরণ করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে।[৭]

এনলাইটেনমেন্ট দর্শনে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের যে দর্শন তাতে আমরা দেখতে পাই, তারা বলছে, "পার্থিব কল্যাণ বা সুখই হলো আরাধ্য, কোনো নাজাত মানবজীবনের সার্থকতা নয়। মানুষ স্বভাবগতভাবেই স্বার্থপর; তাই, এমন পরিবেশ করে দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ সর্বোচ্চ মাত্রায় চরিতার্থ করতে পারে।"

আমরা এখন যে আলোচনা করছি, তা কিন্তু আমাদের ক্যারিয়ারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শুরুতে বিভিন্ন অভিধান থেকে ক্যারিয়ারের যে ডেফিনেশন/সংজ্ঞা আমরা উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এ কথাগুলো মিলিয়ে দেখুন। তারা বলছেন, পার্থিব কল্যাণ বা সুখই আরাধ্য। এটাই আমাদের টার্গেট; কোনো জান্নাত-টান্নাত ইত্যাদি পাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়।[৮]

এই দর্শনের বিষয়গুলো আমাদের ক্যারিয়ারের সঙ্গে যুক্ত। ক্যারিয়ার আমরা কেন গড়ি? দেখা যাচ্ছে, ক্যারিয়ারের বিষয়ই হচ্ছে এটা যে, সর্বাধিক সুখ চরিতার্থ করা, আরও ভালো থাকা এবং সর্বনিম্ন কষ্ট পাওয়া। এই যে একজন ব্যক্তির চিত্র আমরা দেখলাম, যে স্বার্থপর, ধর্ম থেকে স্বাধীন, নিজেই নিজের নৈতিকতার স্রষ্টা—এর ক্যারিয়ার কেমন হবে? আর বিপরীতে একজন মুসলিমের ক্যারিয়ার কেমন হওয়ার কথা? পার্থক্যটা আমরা ধরতে পারছি?

আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম, এগুলোর সবটাই কিন্তু

---

[৭] আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বলেন, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, গজে গজে। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গুইসাপসদৃশ প্রাণী) গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।" সাহাবিরা বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, পূর্ববর্তী বলতে কি ইহুদি-নাসারা উদ্দেশ্য?" তিনি বললেন, "তারা ব্যতীত আর কারা?"—সহিহ বুখারি : ৩৪৫৬; সহিহ মুসলিম : ২৬৬৯

[৮] রাষ্ট্রের কাজ হলো : সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ (ভোগ) নিশ্চিত করা (greatest good for the greatest number)। [utilitarianism, Jeremy Bentham]

বর্তমানে আমরা ব্যক্তিগতভাবে মনের মধ্যে লালন করি। "সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।" ধর্মের কথা যখন কেউ বলতে যায়, তখন বলি, "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এগুলো চলবে না; রাষ্ট্র চলবে রাষ্ট্রের আইনে; ধর্মের আইন মধ্যযুগীয়, এগুলো পুরনো-সেকেলে হয়ে গেছে, অকেজো হয়ে গেছে, সেগুলো এখানে চলবে না।" এ কথাগুলো কিন্তু আমরা প্রায়ই বলি বা শুনি। তাহলে বোঝা গেল, এনলাইটেনমেন্ট যুগে মানুষের যে নতুন সংজ্ঞা, এর ফলে একজন মানুষের সংজ্ঞা যেমন হবে, তার ক্যারিয়ারও তেমন হবে। এজন্য দেখবেন যে, মানুষ চাকরি বা ব্যবসার জন্য সবকিছু করতে রাজি। সুদের কারবার, হালাল-হারামের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ফলমূলে ফরমালিন মেশাচ্ছে, মজুদ রেখে জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, গরিব মানুষকে কষ্টে ফেলে দিচ্ছে, খাদ্যদ্রব্যে বিষতুল্য পদার্থ মিশিয়ে দিচ্ছে। আরও কত কী! 'প্রাণ' যখন আপনাকে ফ্রুটিকা খাওয়াচ্ছে, তখন আমের জুসে আমের বদলে কুমড়োর জুস দিয়ে দিচ্ছে; নানা ধরনের কেমিক্যাল মিশিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ, কোথাও কোনো নৈতিকতা আপনি দেখবেন না। এর পেছনে কারণ হলো, মানুষের ওই নতুন সংজ্ঞা, যার প্রবক্তা হলো ইউরোপীয় দার্শনিকেরা।

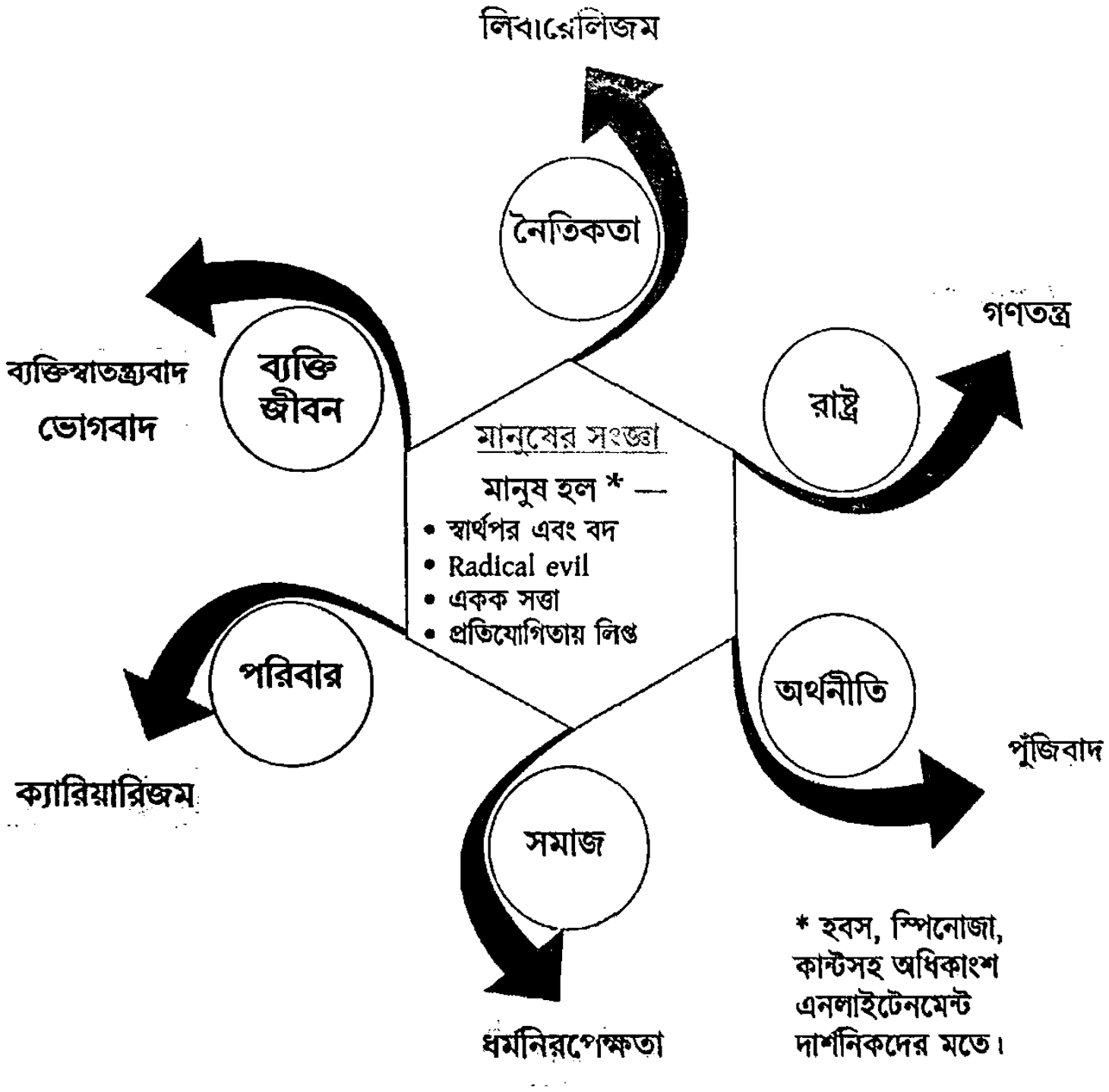

ষোড়শ শতকে তাদের দেওয়া এই নতুন সংজ্ঞানুযায়ী মানুষ হচ্ছে স্বার্থপর ও বদ (Thomas Hobbes); মানুষ হচ্ছে র‍্যাডিকেল এভিল (Emmanuel Kant), একক সত্তা ও সর্বদা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই হলো এনলাইটেনমেন্ট ফিলোসফারদের সংজ্ঞায় 'মানুষ'। এ সংজ্ঞার ওপরে আপনি একটি পরিবার দাঁড় করালে, সে পরিবারটি হবে বদ ও স্বার্থপরদের পরিবার। মা তার ক্যারিয়ারের জন্য সন্তানকে ছেড়ে দিচ্ছে; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামান্য ঝগড়াঝাঁটি না হতেই ডিভোর্স; সন্তানের কথা চিন্তা করার কোনো সুযোগই নেই। ক্যারিয়ারের জন্য পেটের সন্তানকে কেমিক্যাল দিয়ে পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারছে। এবরশনের জন্য যে কেমিক্যাল দেওয়া হয়, তখন পেটের সন্তানটা পুড়ে গলে যায়। এসিডের কারণে যেমন গলে যায়, তেমন। এবরশন করানোর জন্য অনেক সময় ডাক্তাররা বাচ্চার ছোট ছোট কোমল হাত-পাগুলো ভেতর থেকে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বের করে আনে। এগুলো কীসের জন্য? ক্যারিয়ারিজমের জন্য।[৯]

এখন আবার ইউরোপে নতুন কনসেপ্ট আসছে, 'আফটার বার্থ এবরশন'। তারা বলছে, এটা লিগ্যাল হওয়া উচিত। আফটার বার্থ এবরশন মানে বুঝতে পারছেন? জন্মের পর বাচ্চাটাকে মেরে ফেলা! তাদের বক্তব্য হলো, বাচ্চাটার যেহেতু কোনো চিন্তাশক্তি নেই; বাচ্চাটা যেহেতু 'স্বাধীন' কোনো 'ব্যক্তি' নয়। কারণ, 'জন্তু থেকে ব্যক্তি আপনি তখনই হতে পারবেন, যখন হতে পারবেন পরিপূর্ণ স্বাধীন'—এ বিষয়টি যেহেতু বাচ্চার মধ্যে নেই, তার কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেই। ফলে, তাকে মেরে ফেলা আর গর্ভের ভ্রূণ মেরে ফেলা—দুটো একই। গর্ভের ভ্রূণ আর নিউবর্ন বেবি—এ দুইয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই; তাই একে মেরে ফেলার সুযোগ থাকা উচিত। মা চাইলে যেকোনো সময়ে বাচ্চাকে মেরে ফেলতে পারবে![১০]

দেখুন, ইউরোপীয়দের নৈতিকতা কোন পর্যায়ে নেমেছে! একটা মা ক্যারিয়ারের জন্য বাচ্চাকে মেরে ফেলতে পারবে কি না, এটা নিয়ে এখন তাদের আলোচনা শুরু হয়েছে! কারণ হলো, তাদের এই পরিবারটা তো 'স্বার্থপর' ও

---

[৯] পশ্চিমা নৈতিকতার নতুন সংজ্ঞায় অনাগত শিশু তো nonexistence। একজন nonexistence-এর ক্ষতির আশঙ্কায় জীবিত মানুষের হিউম্যান রাইটসে (পড়ুন, 'ফুর্তি') হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এই নৈতিকতায় গর্ভপাত 'তেমন কিছু না'। আমেরিকার গর্ভপাতের এক-তৃতীয়াংশই হয় গর্ভধারণের ষষ্ঠ সপ্তাহের পর। [U.S. Abortion Statistics [abort73.com]]

[১০] Giubilini A, Minerva F (2013), After-birth abortion : why should the baby live? Journal of Medical Ethics 2013; 39 : 261-263.

'বদ'-এর পরিবার। 'র‍্যাডিকেল এভিল', 'একক সত্তা', 'প্রতিযোগিতায় লিপ্ত' এই যে একটা বদ, এই বদের পরিবারই হচ্ছে 'ক্যারিয়ারিজম দ্বারা পরিচালিত পরিবার'। এখানে স্বামী তার ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত; সেই ভোর ছয়টায় যাচ্ছে, রাত দশটায় আসছে; পরিবারের জন্য কোনো সময় নেই। স্ত্রীও তার ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত। সন্তান বড় হচ্ছে বুয়ার কাছে। আমরা কিন্তু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভিডিও-সিসিটিভি ফুটেজ দেখেছি যে, বাচ্চার সঙ্গে বুয়া কী আচরণ করছে, বাচ্চাকে এমনভাবে পেটাচ্ছে, এবিউজ করছে... আহ! বাচ্চার মা-বাবা দুজনেই চাকরিতে।

লক্ষণীয় হলো, আপনি মানুষের সংজ্ঞাটা যখন ভুল দেবেন, তখন এর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পরিবারটা পরিচালিত হবে ভুলভাবে, যেমন ক্যারিয়ারিজমের মাধ্যমে, যেখানে প্রকৃত পরিবারের কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না; সবাই হবে ক্যারিয়ারিস্ট। একজন মানুষ যখন এই সংজ্ঞাটা নিয়ে নেবে, তখন সেই মানুষটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী (individualism) হয়ে উঠবে; 'কার কী হলো, আমার দেখার দরকার নেই, আমি নিজে ওপরে উঠতে পারলেই হলো।' সে হয়ে উঠবে ভোগবাদী; সবকিছু ভোগ করতে চাইবে, এটাও ক্যারিয়ারিজমের সঙ্গে যুক্ত। যখন ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবনে মানুষ যখন এটা গ্রহণ করবে, তখন এই পরিণতিই হবে। একইভাবে নৈতিকতা, লিবারেল রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র—এ সবগুলোর বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য হবে, একই পরিণতি হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে মূলত একটা 'স্বার্থপর ও বদের রাষ্ট্র'। এবং এই চিন্তাধারা থেকে যখন অর্থনীতি করা হবে, তখন পুঁজিবাদ জন্ম নেবে—'বদের অর্থনীতি'। এমন মানুষদের সমাজই হবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ—'বদের সমাজ'। কেননা মূল সংজ্ঞাই তো 'স্বার্থপর ও বদ'।

তাহলে আমরা পুরো আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম, ক্যারিয়ারের পশ্চিমা কনসেপ্ট হলো একটা ভয়ংকর কনসেপ্ট, যেটা আমরা এখন লালন করছি, আমাদের শেখানো হচ্ছে। সামনে বোনদের ক্যারিয়ার নিয়ে আলাপের সময় দেখব যে, ক্যারিয়ারিজমের এই কনসেপ্টটা পশ্চিমাবিশ্বের সমাজ, নীতিনৈতিকতা, সবকিছুকে কীভাবে শেষ করে দিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে।

ইসলামে রিজিকের ধারণা

আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম যে, পশ্চিমা কনসেপ্টে ক্যারিয়ার বিষয়টা কেমন, এর উদ্দেশ্যগুলো কী কী। যেমন তারা বলছে, সফলতা হলো সর্বাধিক ভোগ। নীতিনৈতিকতা সব বিসর্জন দিয়ে সর্বাধিক ভোগ করতে পারলেই আপনি সফল। আমরাও কিন্তু বর্তমানে 'সফলতা' বলতে এগুলোকেই বুঝতে শুরু করেছি—'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'। 'গাড়িঘোড়া চড়তে পারাই' সফলতা। একজন নারীকে তার ক্যারিয়ারের বিচারে সফল বলা হচ্ছে। দেখেন না, পত্রিকায় আসে 'সফল নারীরা'। এর মানে হলো, ক্যারিয়ারে কে কত ওপরে উঠতে পেরেছে। অন্যান্য বিষয় সে কতটা ম্যানেজ করতে পারে, পরিবারকে কতটা ম্যানেজ করতে পারে, সন্তানকে সুনাগরিক করতে পারল কি না, এগুলো কিন্তু তার সফলতার মাপকাঠি হচ্ছে না; বরং সফলতার মাপকাঠি হচ্ছে ক্যারিয়ার।

এরপর দেখুন, আমরা ছোটবেলায় পড়েছি 'জীবনের লক্ষ্য কী'? জীবনের লক্ষ্য হলো, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হওয়া, ক্যারিয়ার গড়া। ভালো মানুষ হওয়া—এটা কিন্তু আমরা কেউ 'এইম ইন লাইফ' রচনায় লিখিনি। আগে একটা গল্প শুনেছিলাম যে, আমেরিকায় একটা স্কুলে যখন 'এইম ইন লাইফ' লিখতে দিয়েছে, তখন এক মুসলিম শিশু লিখেছে, "আমি সাহাবি হব।" তখন এটা দেখে খ্রিষ্টান ম্যাডাম অবাক হয়ে গেছে, কী ব্যাপার, সাহাবি হবে মানে?! হোয়াট ইজ সাহাবি?! গার্ডিয়ানকে কল করে বলা হলো যে, আপনার বাচ্চা এইম ইন লাইফ রচনায় লিখেছে—"আমি সাহাবি হব।" এই সাহাবিটা কী জিনিস? তখন গার্ডিয়ান ব্যাখ্যা করে বললেন যে, সাহাবি হলেন এমন মানুষ, যারা একেকজন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একেবারে হাতে গড়া; কুরআন ও হাদিসের সোনার পরশে গড়া এমন মানুষ, যাদের মতো মানুষ আর কেউ হবে না দুনিয়ায়; এমন সুন্দর ও চমৎকার মানুষ। এটা শুনে

আল্টিমেটলি ম্যাডাম ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটা একটা শোনা গল্প, এর সত্য-মিথ্যা আমি জানি না।

দেখুন, আমরাও কিন্তু 'এইম ইন লাইফ'-এ দেখতে পাচ্ছি যে, ডাক্তার হব, ইঞ্জিনিয়ার হব, আর্মি অফিসার হব, আরও নানান কিছু হব। এর মানে, ইউরোপ 'জীবনের লক্ষ্য' বলতে যে জিনিসটাকে বোঝে, আমরাও তার থেকে আলাদা কিছু বুঝি না, ভাবি না; বরং একই চিন্তা-চেতনা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে আছে। সফল নারী, সফল ব্যক্তি—এসব টার্মে আমরা তা-ই বুঝি, ইউরোপ যা বোঝে ও বোঝায়।

এখন তাহলে ভাবুন, আমার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য কী হবে? আমার লক্ষ্য কি 'আল্লাহকে খুশি করা' হবে? ধর্মীয় বিষয় হবে? জান্নাত ও আখেরাত হবে? ওদের চিন্তাদর্শনে এই প্রশ্নগুলোর জবাব হলো, না! আমার সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে, ইহকালকে কীভাবে আমি ইনজয় করব। আমার বাবা উপজেলায় একটি বাড়ি করেছেন, আমি কীভাবে ঢাকায় একটি বাড়ি করতে পারব। বাবার চেয়ে আরও ওপরের পর্যায়ের ভোক্তা কীভাবে হতে পারি, সেটাকেই বলা হচ্ছে সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য; পার্থিব সুখ, পার্থিব উন্নতি।

সেক্যুলারিজমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—ইহলৌকিকতা; ইহলোককেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা, ইহলোকই সবকিছু; ইহলোকের বাইরে অন্যান্য বিষয়কে গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় মনে করা। আমার কর্মপ্রচেষ্টার লক্ষ্য হতে হবে সেক্যুলার; আমার স্বপ্ন-সাধনা-হাসি-কান্না সব হবে সেক্যুলার। সেদিন একটা ভিডিও দেখলাম, চিত্রনায়ক শাকিব খানের জন্য এক ছেলে কাঁদছে। বলছে, "আমি সেই সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি, ভাই, আপনাকে একনজর দেখব বলে। বিশ্বাস করেন, ভাই, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে...।" মানে, শাকিব খানের উদ্দেশে সে এ কথাগুলো বলছে। তো তার অবস্থাটা চিন্তা করুন, সকাল থেকে এত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে, তার সমস্ত কষ্টের লক্ষ্য হলো এই আজেবাজে সামান্য বিষয়। কোনো খেলুড়ে দলের জয়-পরাজয়ের সাথে আমার অন্তরের সুখ-দুঃখ বাঁধা, যারা আমাকে চেনেও না। তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম, ইউরোপীয় জীবনদর্শন আর আমাদের জীবনদর্শন হুবহু এক হয়ে গেছে। উপনিবেশ আমলে ব্রিটিশরা আমাদেরকে ইউরোপীয় জীবনদর্শন শিখিয়ে গেছে। ফলে, তারা আর আমরা খুব বেশি আলাদা নই; ইসলাম থেকে আমরা বহু দূরে সরে এসেছি। ইসলামি চিন্তা-চেতনা—আল্লাহ যা বলেছেন, রাসুল আমাদেরকে যা বুঝিয়েছেন

হাতে-কলমে প্রতিটা বিষয়ে—আমরা সেখান থেকে অনেক দূরে সরে গেছি।

ক্যারিয়ারের বিষয়েও এটাই হয়েছে। ক্যারিয়ার বিষয়ে প্রচলিত ধ্যানধারণা নিয়ে এই বইটি পড়তে শুরু করলে, পাঠক অনেক ক্ষেত্রেই আশাহত হবেন; অনেক অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু আমার দায়িত্ব হচ্ছে যে, আমি যা জানি, যা বুঝেছি, তা পরিপূর্ণভাবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথাগুলো, পরবর্তী সময়ের ওলামায়ে কেরামের হক কথাগুলো হুবহু আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আশা করি, এতক্ষণের আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পশ্চিমে ক্যারিয়ারের ধারণা কী, আমাদের অঞ্চলে এ বিষয়ের ধারণা কী, এবং এই ধারণা আমরা কোথা থেকে পেলাম, ইত্যাদি। এখন আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি 'ইসলামে রিজিকের ধারণা কী?' এই আলোচনায়।

রিজিক শুধু বস্তুগত বিষয় নয়

আমরা বাংলায় রিজিককে বলি 'জীবনোপকরণ'। মানে, জীবন চালাতে কী কী লাগে, তাকে বলে জীবনোপকরণ বা রিজিক। ইসলামের কনসেপ্ট হচ্ছে, রিজিক শুধু বস্তগত কোনো বিষয় নয়। যেমন দেখুন—

বস্তুগত	অবস্তুগত
ওষুধ	রোগমুক্তি
খাবার	ক্ষুধা মেটা
সতেজতা	ঘুম
অর্থসম্পদ	প্রয়োজন মেটা

- বস্তুগত রিজিক হচ্ছে 'ওষুধ'; অবস্তুগত রিজিক হচ্ছে 'রোগমুক্তি'। মানে, ওষুধ আপনি সেবন করবেন, কিন্তু ওষুধ সেবন করলেই যে সবসময় রোগমুক্তি লাভ হবে, তা নয়।

- একইভাবে, বস্তুগত রিজিক হচ্ছে ঘুম; অবস্তুগত রিজিক হচ্ছে সতেজতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,

"আমার চোখের শীতলতা হচ্ছে নামাজে"।[১১] সমস্ত ক্লান্তি ভুলে আল্লাহর রাসুল সতেজ হয়ে যান, যদি তিনি নামাজ পড়তে পারেন। তার মানে, সতেজতাটা ঘুম ছাড়াও আল্লাহ তাআলা দিতে পারেন। আবার, আমাদের বিজ্ঞানীরা এ কথা বলেন যে, কারও যদি সতেজ লাগতে হয়, ঘুমের পরে কারও যদি সতেজ অনুভব হতে হয়, তাহলে তাকে বারোটার আগে দুই ঘণ্টা ঘুমাতে হবে; বা, তার প্রতিদিন ছয় থেকে সাত ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। আবার এমন মানুষের সঙ্গেও আপনার পরিচয় হবে, যে দিনে মাত্র দুই ঘণ্টা ঘুমায় এবং ওই দুই ঘণ্টার ঘুমেই সে এক্টিভ হয়, সতেজতা লাভ করে। এটা আল্লাহ তাআলার দান, তিনি যাকে যেমন তাওফিক দেন, সে তেমন পায়; এটা অবস্তুগত রিজিক, যা সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে আসে।

- আবার দেখুন, বস্তুগত রিজিক হচ্ছে 'খাবার'; আর অবস্তুগত রিজিক হচ্ছে, 'ক্ষুধা মেটা' বা 'স্বাদ'। আপনি বাজার থেকে বোয়াল মাছ কিনে আনলেন বাড়িতে, কিন্তু রান্নাটা ভালো হলো না; আপনার স্ত্রী ভালোভাবে রাঁধতে পারলেন না। তার মানে, আপনি বস্তুগত রিজিক খাবারটা ইনকাম করে আনতে পারলেও, অবস্তুগত রিজিক স্বাদটা পেলেন না। আবার দেখা গেল, খাবার আপনি কিনছেন, কিন্তু খেতে পারছেন না ডায়াবেটিস বা নানান অসুবিধায়। মানে, কেনার পরেও খাবারটা গ্রহণ করতে পারছেন না। অর্থাৎ, খাওয়ার তাওফিক, ক্ষুধা মেটা, খেতে পারা, স্বাদ হওয়া—এ বিষয়গুলো হলো অবস্তুগত রিজিক। খাবার পেয়ে গেলেই যে এ বিষয়গুলো আপনার লাভ হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। অনেকে দেখবেন যে, অনেক খাচ্ছে, কিন্তু তার ক্ষুধা মিটছে না। ক্ষুধা মেটে না, এমন অসুখ আছে। আবার অনেকের দেখা যায়, পেটটা এত ফেঁপে আছে, ভালো ভালো খাবারও সে খেতে পারছে না। বস্তুগত রিজিক সে কামাই করে এনেছে, কিন্তু পেট ফাঁপা হয়ে থাকার কারণে, পেটে গ্যাস জমে থাকার কারণে সে খেতে পারছে না। এটা হলো অবস্তুগত রিজিকের বিষয়।

এখানে একটি হাদিসের কথাও স্মরণীয়। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, শেষ

---

[১১] সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৩৯; মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৬৭৬; মুসনাদু আহমাদ : ১২২৯২; হাদিসটি সহিহ

জামানায় খাবারের খুব অভাব দেখা দেবে, দুর্ভিক্ষ হবে; মুমিনরা তখন ঈমান-আমল বাঁচানোর জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেবেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সেখানে খাবার ও পানীয়ের কী ব্যবস্থা হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেখানে আল্লাহর জিকিরই হবে তাদের খাবার; তারা জিকির করবে, আর তাদের পেট ভরে যাবে।[১২] বোঝা গেল, অবস্তুগত রিজিক যে 'ক্ষুধা মেটা', এর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় বস্তুগত খাবারের প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ এই বস্তুগত রিজিক ছাড়াও অবস্তুগত বিষয়গুলো চাইলে আমাদেরকে দিতে পারেন। তিনি চাইলে, ওষুধ ছাড়াও রোগমুক্তি দিতে পারেন; খাবার ছাড়াও ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে পারেন; ঘুম ছাড়াও আল্লাহ তাআলা সতেজতা দান করতে পারেন। বস্তুগত রিজিক আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন; জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন; কিন্তু অবস্তুগত রিজিক আসে একমাত্র আল্লাহ তাআলার থেকে। তবে, তিনি চাইলে বস্তুগত রিজিক ছাড়াও ওই বিষয়গুলো আমাদেরকে দিতে পারেন। দেখুন, বস্তুগত রিজিক হচ্ছে অর্থসম্পদ, টাকাপয়সা। আর অবস্তুগত রিজিক হচ্ছে 'প্রয়োজন মেটা'। এখন টাকা থাকলেই যে আপনার প্রয়োজন মিটে যাবে, তা কিন্তু নয়। আবার আল্লাহ তাআলা চাইলে, অর্থ ছাড়াও আপনার প্রয়োজনটা মিটিয়ে দিতে পারেন।

যেমন, আমি একটা উদাহরণ দিই। দেখবেন, যাদের অর্থসম্পদ বেশি, তার অভাবও তত বেশি। একটি চমৎকার হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলছেন,

> "হে আমার বান্দা, তুমি আমার ইবাদতের জন্য, আমার জিকিরের জন্য অবসর হয়ে নাও, অবসর করে নাও। যদি তুমি তা না করো, তাহলে আমি তোমার দুই হাতকে শত শত কাজ দিয়ে ভরে দেবো কিন্তু তোমার অভাব কখনো পূরণ করব না। আর যদি তুমি আমার জিকিরের জন্য নিজেকে অবসর হয়ে নাও (মানে, অবসর তো তোমার কাছে আসবে না, তুমি নিজে যদি অবসর তৈরি করে নাও) তাহলে আমি তোমার অন্তরকে ধনী করে দেবো।"[১৩]

---

[১২] সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৭৭; সহিহুল জামি : ৭৮৭৫; সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ২৪৫৭; ইবনি মাজাহর সনদটি দুর্বল। তবে হাদিসের ভাষ্য সহিহ।

[১৩] সুনানুত তিরিমিযি : ২৪৬৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০৭; সহিহু ইবনি হিব্বান : ২০৯৮; হাদিসটি সহিহ

যার অন্তর ধনী, তার তো বেশি অর্থসম্পদের প্রয়োজন নেই; কারণ, তার তো প্রয়োজনই কম, অত অর্থসম্পদ দিয়ে সে করবেটা কী। মানে, তার প্রয়োজন তো এমনিতেই মিটে আছে, পূরণ হয়েই আছে। দেখবেন, যার যত অর্থসম্পদ বেশি, তার তত লৌকিকতা বেশি। লৌকিকতার একটা চাহিদা আছে, তার খরচ বেশি, দেখানেপনা বেশি, ভোগবিলাসও বেশি। মানে, আয় বেশি বলেই যে তার প্রয়োজন মিটছে, তা নয়। বরং তার আরও প্রয়োজন বাকি রয়ে যাচ্ছে, অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। কারণ, তার অন্তর ধনী নয়। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে অভাবী করে দিয়েছেন, তাই টাকাপয়সা তার প্রয়োজন মেটাতে পারছে না।

তাহলে, আমরা একটা বিষয় লক্ষ করলাম যে, প্রয়োজন মেটা একটা রিজিক। আবার, অর্থসম্পদ আলাদা রিজিক। কিন্তু আমাদের মুশকিলটা হলো, আমরা রিজিক বলতে এই খাবার ও অর্থসম্পদকেই শুধু বুঝি। আর বাকি যে রিজিকগুলো আছে, সেগুলো সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই। মানে, আমরা রিজিক বলতে শুধু বস্তুগত রিজিকটাকেই বুঝি; অবস্তুগত বিষয়গুলোকে আমরা রিজিক বলতে চাই না। অথচ অবস্তুগত বিষয়গুলোও রিজিক এবং আল্লাহ তাআলা চাইলে সেগুলো আমাদেরকে বস্তুগত মাধ্যম ছাড়া সরাসরিই দিতে পারেন। আবার, বস্তুগত রিজিক থাকলেও, অবস্তুগত প্রয়োজন পূরণ নাও হতে পারে, যদি আল্লাহ না চান। এই হলো ইসলামে রিজিকের কনসেপ্ট।

যে রাস্তাগুলো দিয়ে আল্লাহ রিজিক পৌঁছান

১. সালাত বা নামাজ

যে রাস্তাগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় রকমের রিজিক পৌঁছান, তার মধ্য থেকে এক নম্বর হলো নামাজ। নামাজের মাধ্যমে এবং নামাজের দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা রিজিক পৌঁছান। আল্লাহ বলছেন,

> “হে রাসুল, আপনি আপনার পরিবারদেরকে নামাজের আদেশ করুন, নিজেও অবিচল থাকুন; (নিজেও নামাজ পড়ুন, আর, নামাজের দাওয়াত দিন) আমি আপনার কাছে রিজিক চাই না; বরং আমিই আপনাকে রিজিক দিই।”[১৪]

---

[১৪] সুরা তহা : ১৩২

আমি আপনাকে রিজিক দেবো, আপনি মানুষকে নামাজের দাওয়াত দিন, আপনি দাওয়াতের কাজ করুন, মেহনত করুন, নিজে আমল করুন, আরেকজনকে আমলের দাওয়াত দিতে থাকুন, আমি আপনাকে রিজিক দেবো। তার মানে, সালাতের দ্বারা রিজিক আসে। দু রাকাত সালাত আপনি পড়লেন, আল্লাহর কাছে চাইলেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ওষুধ ছাড়াই সুস্থ করে দিলেন। এরকম রিজিক আসতে পারে।

২. তাকওয়া বা স্রষ্টানুভূতি

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে ইসলামের বিধিবিধানকে শক্তভাবে মেনে চলা। হালাল-হারামগুলো বেছে চলা, আল্লাহকে হাজির-নাজির মনে করা যে, আল্লাহ আমার সামনে উপস্থিত, আমি কীভাবে গুনাহ করতে পারি। সুরা তালাকে বলা হচ্ছে—

> "যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিজিক দান করেন, যার ব্যাপারে তার কোনো ধারণাও ছিল না।"[১৫]

তার কোনো কল্পনাও নেই যে, এখান থেকে তার রিজিক আসতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন সমস্ত জায়গা থেকেও রিজিক দেবেন।

৩. তাওয়াক্কুল

আল্লাহর ওপর ভরসা করা। অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, বিপদে হোক, আনন্দে হোক—সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা, ভরসা করা, নির্ভর করা। পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা যে, আল্লাহ আপনিই করবেন; আমার কোনো শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই; আপনিই করেন, আপনিই করবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস,

> "যদি তোমরা সঠিকভাবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে রিজিক দান করতেন, যেমন পাখিকে রিজিক দান করেন। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়, পেট পূর্ণ করে রাতে ফিরে আসে।"[১৬]

---

[১৫] সুরা তালাক : ২-৩

[১৬] সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৪; সুনানুন নাসায়ি : ১১৮০৫; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৬৪; হাদিসটি সহিহ

অর্থাৎ, পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর ভরসা করা। নিজের শক্তির ওপর ভরসা না করে, কোনো এমপি-মন্ত্রী-মিনিস্টারের তদবির-সুপারিশের ভরসা না করে, নিজের যোগ্যতার ওপর ভরসা না করে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার কুদরতের ওপর ভরসা করা যে, আল্লাহই করবেন। আল্লাহ তাআলা 'কুন' (হয়ে যাও) বলার দ্বারাই 'ফাইয়াকুন' (হয়ে যায়)। আল্লাহ চাইলেই হয়ে যায়। গভীরভাবে আল্লাহর ওপর নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, তাওয়াক্কুল করা। এর মাধ্যমে রিজিক আসে; পাখির মতোন রিজিক আসে।

৪. ইসতিগফার

প্রতিদিন বেশি বেশি আল্লাহর কাছে তাওবা করা, ক্ষমা চাওয়া। এর মাধ্যমে রিজিক আসে। একটি হাদিসে এসেছে,

> "যে ব্যক্তি বেশি বেশি ইসতিগফার করবে, আল্লাহ তাকে সব সংকট থেকে উত্তরণের পথ বের করে দেবেন; সব দুশ্চিন্তা মিটিয়ে দেবেন এবং অকল্পনীয় উৎস থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেবেন।"[১৭]

তাহলে, ইসতিগফারের মাধ্যমে রিজিক আসে। আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না যে, কোত্থেকে আপনার রিজিক আসছে।

৫. কামাইয়ের চেষ্টা

যেটা আমরা করি। এবং রিজিকের তালাশ বলতে শুধু এটাই বুঝি ও বোঝাই। কুরআনের আয়াতে বলা হচ্ছে,

> "অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো। আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো (অর্থাৎ, জিকিরের সাথে...), যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১৮]

৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা

একটি হাদিস আছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

"যে ব্যক্তি কামনা করে, তার রিজিক প্রশস্ত করে দেওয়া হোক এবং তার আয়ু

---

[১৭] হাকিম, মুসতাদরাক : ৭৬৭৭। সহিহ সূত্রে বর্ণিত

[১৮] সুরা জুমুআ : ১০

দীর্ঘ করা হোক, সে যেন তার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।"[১৯]

অর্থাৎ, আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর রাখা, সুখে-দুঃখে তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, সম্পর্ক ঠিক রাখা। এর মাধ্যমে রিজিক প্রশস্ত হয়।

৭. বিবাহ করা

- কুরআনে এসেছে :

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন।..."[২০]

- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"নারীদেরকে বিয়ে করো, নিশ্চয়ই তারা সম্পদ (সৌভাগ্য) নিয়ে আসে।"[২১]

- আরেক হাদিসে এসেছে,

"বিবাহের দ্বারা রিজিক তালাশ করো।"[২২]

- উমর রা. বলেন,

"আমি ওই লোকের প্রতি আশ্চর্য হই, যে বিবাহের দ্বারা রিজিক খুঁজে নেয় না...।" (এরপর তিনি ওপরের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন দলিল হিসেবে।)[২৩]

তার মানে, বিবাহের মাধ্যমে রিজিক আসে। তাহলে দেখুন, রিজিকের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মোট ছয়টি 'দোকান' দিয়েছেন; কিন্তু আমি দোকান খোলা রেখেছি শুধু একটি। কেবল ব্যবসা আর চাকরির দোকান। একটিমাত্র দোকান খোলা রেখে আমি বলছি, 'আল্লাহ, আমার অভাব দূর হয় না, আমার অভাব দূর করে দিন; আল্লাহ, আপনি আমার রিজিকে বরকত দান করুন, আমার রিজিক বাড়িয়ে দিন।' বাকি সাতটি দোকান বন্ধ রেখে আমি

---

[১৯] সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৫, সহিহ মুসলিম : ৪৬৩৯

[২০] সুরা নুর : ৩২

[২১] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা : ১৬১৬১, মুরসাল, নির্ভরযোগ্য

[২২] আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, হাদিস : ১৬২

[২৩] প্রাগুক্ত

বলছি, আমার রিজিকের অভাব দূর হয় না। ক্যারিয়ার মানে যদি হয় রিজিকের তালাশ, তবে এই সাটটি মিলে হলো আমাদের ক্যারিয়ার, নাকি?! ক্যারিয়ার যদি হয় পেশা বা টাকা-রিজিক উপার্জনের মাধ্যম, তাহলে তো আমাকে বাকি ছয়টি দোকানও খোলা রাখতে হবে। রিজিক মানে শুধু টাকা নয়, শুধু খাবার নয়; রিজিক মানে সবকিছু: টেনশন-ফ্রি জীবন, রোগমুক্ত জীবন, এগুলোও।

এই সাতটি দোকানের সাতটিই খুলে রাখতে হবে। তাহলে, আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আমাদের জন্য ভরপুর রিজিকের ফয়সালা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। রিজিক মানে শুধু টাকা নয়, শুধু খাবার নয়; রিজিক মানে সবকিছু—টেনশন-ফ্রি জীবন, রোগমুক্ত জীবন, এগুলোও। এই সাতটা দোকান খোলা রাখলে আপনি অবাক হয়ে দেখবেন, আপনার অনেককিছু হয়ে যাচ্ছে, কোনো টাকাপয়সা ছাড়াই; কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাচ্ছে। আপনার প্রয়োজনগুলো মিটে যাচ্ছে। কীভাবে মিটে যাচ্ছে, আপনি জানেন না; সবকিছু জানা থাকা তো জরুরিও না। আল্লাহ তাআলা মিটিয়ে দিচ্ছেন। বা আপনার প্রয়োজন কমিয়ে দিচ্ছেন। বরকত দিচ্ছেন।

বরকত বিরাট জিনিস। যখন যা পাওয়া দরকার পেয়ে যাচ্ছেন। যখন যে কাজটা হওয়া দরকার, হয়ে যাচ্ছে। একে বলা হয় বরকত। বরকত কিন্তু মাপা যায় না, তবে বোঝা যায়। আমার কাজটা হয়ে যাচ্ছে, আমার প্রয়োজনটা পূরণ হয়ে যাচ্ছে, বা ওই জিনিসটা আমার প্রয়োজনের তালিকা থেকেই সরে গেছে। আমি যতটুকু টাকা আয় করি, এ দিয়েই আমার সব প্রয়োজন মিটে গিয়ে আবার হজও করে এসেছি। এই হলো বরকত। দেখবেন, আপনার অনেক কাজ হয়ে যাচ্ছে অল্পতেই বা এমনিতেই, সুবহানাল্লাহ।

রিজিক অপরিবর্তনীয়

জীবিকা হচ্ছে রিজিকের মধ্যে একটি অংশ। আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি, আমাদের বস্তুগত যে রিজিক রয়েছে (অর্থসম্পদ, খাবার, ওষুধ কেনার জন্য টাকা), এগুলোর সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। এগুলোর সঙ্গে কর্মপ্রচেষ্টার সম্পর্ক রয়েছে, যাকে আমরা ক্যারিয়ার বলছি। জীবিকা তথা আয়সম্পদ হচ্ছে রিজিকের অংশ, আর রিজিক হচ্ছে তাকদিরের অংশ।

ওদিকে কারিকুলামে পশ্চিমা দর্শন আমাকে জানাচ্ছে যে, তোমাকে সর্বোচ্চ

পর্যায়ে উঠতে হবে। বেশি বেশি আয় করতে হবে, বেশি বেশি ভোগ করতে হবে, তাহলেই তুমি সফল। আর ইসলাম আমাকে বলছে, তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন, তোমার আয়-রোজগার-ইনকাম ফিক্সড। রিজিক তাকদিরের অংশ, এটা নির্ধারিত, ফিক্সড। এখানে বাড়া-কমার সুযোগ নেই। তবে এমন হতে পারে, যা কষ্টের মধ্য দিয়ে আসত, সেটা সহজে আসছে। যা অপমানের হাত ধরে আসত, তা সহজতা ও ইজ্জতের সঙ্গে আসছে। যে রিজিকটা আমার, সেটা আমার জন্য ফিক্সড। কিন্তু সেটা কমিয়ে দেওয়া বা বাড়িয়ে দেওয়া, প্রশস্ত করা বলতে কী বোঝানো হচ্ছে, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করছি। আপনি একটি মুরগির বাচ্চাকে চাইলে ধান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিতে পারেন, বিভিন্ন দিকে ছিটিয়ে দিলেন, সে সারাদিন ধরে ঘুরবে আর কষ্ট করে করে একেকটা দানা খুঁটে খাবে। আবার, আপনি চাইলে এক জায়গাতেই দিতে পারেন, সে এসে একসাথে সব খেয়ে ফেলল, সময় ও শ্রম বেঁচে গেল। তার মানে, রিজিকের সংকীর্ণতা হলো, আপনি সারাদিন কষ্ট করে একটা কিছু অর্জন করলেন। আর প্রশস্ততা হলো, সে জিনিসটাই অল্প সময়ে, অনায়াসে, কম চেষ্টায় ও কম কষ্টে অর্জন করলেন। যেমন মুরগির বাচ্চাকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে না দিয়ে এক জায়গায় খাবার দিলেন, সে সহজে খেয়ে চলে গেল। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, আয়সম্পদটা রিজিকের অংশ, এটা ফিক্সড। ক্যারিয়ারের দ্বারা এটাই আমার কাছে আসবে; এর চেয়ে বেশি আসা সম্ভব নয়। এবং এটা আমার কাছে কষ্টের সঙ্গে আসবে, নতুবা আরামের সাথে। হয়তো হেনস্থার মাধ্যমে আসবে, নতুবা ইজ্জতের ও সম্মানের হাত ধরে আসবে। হয়তো এটা হালালের মাধ্যমে আসবে, অথবা হারামের মাধ্যমে আসবে।

- আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের জীবনোপকরণ ও তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা সব আকাশে আছে।"[২৪]

- আরেকটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, "এবং পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, সবার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহরই।"[২৫]

- আরেকটি আয়াতে বলেছেন, "তোমার পরিবারের লোকদের সালাতের নির্দেশ দাও, আর এর ওপর অটল থাকো। আমি তোমার কাছে

---

[২৪] সুরা যারিয়াত : ২২

[২৫] সুরা হুদ : ৬

জীবনোপকরণ চাই না, বরং আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই...।"[২৬]

তার মানে বোঝা গেল, সব আকাশে আছে, সব আল্লাহর তরফ থেকে ওপর থেকে ফয়সালা হয়। তাহলে কেন কাজ করছি আমরা? দুনিয়ার কর্মপ্রচেষ্টাটা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে করতে বলেছেন; আল্লাহ বলেছেন বলে আমরা করি। কিন্তু এটার দ্বারা কতটুকু কী আসবে, তার ফয়সালা হবে ওপরে, এর ফয়সালা করবেন আল্লাহ তাআলা। আর আমরা কামাই-রুজি করব, কারণ এটা পুরুষের ওপর ফরজ, আল্লাহ করতে বলেছেন, তাই। কিন্তু আমার অন্তরের বিশ্বাস থাকবে, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসবে; রাজ্জাকের পক্ষ থেকেই রিজিক আসে। আমি পুরো জীবনে কত টাকা আয় করব, সেটা লিখিত। কে আমার জীবনসঙ্গী হবে, সেটাও লিখিত। কবে, কোথায় মারা যাব, তাও লিখিত। এবং কতটা খাবার ও পানীয় আমি গ্রহণ করব, তাও লিখিত বা নির্দিষ্ট।

- হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে মাখলুকের তাকদির লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। (মানে, আমার-আপনার তাকদির, আমার-আপনার রিজিক, অর্থ, কামাই—এগুলো আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (রাসুল আরও বলেছেন,) তখন আল্লাহর আরশ (সিংহাসন) পানির ওপরে ছিল।"[২৭]

- আরেকটি হাদিসে হজরত মুতাল্লিব ইবনে হানতাব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"নিশ্চয়ই জিবরিল আমার অন্তরে ওহি ঢেলে দিয়েছেন, অবশ্যই রিজিক শেষ হওয়ার আগে কারও মৃত্যু হয় না; সুতরাং তোমরা হারাম ছেড়ে হালাল পথে রিজিকের অনুসন্ধান করো।"[২৮]

- আরেকটি হাদিসে এসেছে,

"আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় লিখে অবসর হয়ে গেছেন; তার মৃত্যুর সময়, তার (ভালা-মন্দ) আমল, তার মৃত্যুর সময়, তার রিজিক, তার

---

[২৬] সুরা তহা : ১৩২

[২৭] মুসলিম : ২৬৫৩

[২৮] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৯/২৫৪

পদচ্ছাপ, তার কবর।" [২৯]

তার মানে, আমার-আপনার যে রিজিক, সেটা আসমান জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তাকদিরে লেখা শেষ। এবং আমার রিজিকটুকু শেষ না করে আমি মৃত্যুবরণ করব না। দোকানি আপনাকে ঠকিয়ে দশ টাকা নিয়েছে, এটা ওর রিজিকই ও নিয়েছে; ও আমার-আপনার ভাগ থেকে নেয়নি। এটা একটু স্পষ্ট করি, দোকানে গিয়ে আমি কথার কথা দশ টাকা ঠকে গেলাম। এটা ওর রিজিকটাই বিক্রেতা নিয়েছে হারামভাবে। আমার রিজিক থেকে ও নেয়নি। তাই, ঠকে যাওয়ার পরে যে আমরা কষ্ট পাচ্ছি, এই কষ্ট পাওয়ার কিছু এতে নেই। পকেটমার পকেট থেকে দশ হাজার টাকা নিয়ে গেল, এটা ওর রিজিকটাই ও নিল। আমার অংশ থেকে কিছু নেয়নি; আমার থেকে ও কোনোদিন কিছু নিতে পারবে না।

তাহলে আমরা পুরো রিজিকের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করি; পশ্চিমের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের বিরোধ ও সংঘর্ষটা কোথায়, সেটা বোঝার চেষ্টা করি। তাদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষটা হচ্ছে, তারা বলতে চায়, বেশি বেশি কামাই করবে, বেশি বেশি ভোগ করবে। আর আমাদের (ইসলামের) কথা হচ্ছে যে, না, তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন, তুমি বেশি কামাই করতে পারবে না। তুমি যেটা কামাই করবে, সেটা আল্লাহ তাআলা লিখেই রেখেছেন, ফিক্সড। এখন তুমি সেটা হালালভাবে অর্জন করবে, নাকি হারামভাবে করবে; শরীরকে কষ্ট দিয়ে করবে, নাকি আরামে করবে; ইজ্জতের সাথে করতে চাও, নাকি অপমানের সাথে—এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এটার পরিমাণ ফিক্সড, এর চেয়ে বেশি কামাই করতে আমরা পারব না।

বস্তুগত জীবিকা উপার্জনের বিধান

ইসলামে জীবিকার গুরুত্ব

- হালাল জীবিকা অনুসন্ধান প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। (আলজামিউস সগির লিস-সুয়ুতি, হাদিস : ৫২৭২)

প্রত্যেক মুসলিম বলতে যদিও নারী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায়, কিন্তু এখানে

---

[২৯] মুসনাদে আহমাদ। হাদিস : ২১৭২৩

কিছুটা ভিন্নতা আছে। পুরুষের ওপর তার অধীনস্থদের ভরণপোষণ ওয়াজিব, নারীদের ওপর নয়। এর আলোচনা পরে বিস্তারিত আসবে।

- ফরজ সালাতের পর, জীবিকা অনুসন্ধান হলো ফরজের পর ফরজ। (তাবারানি, বাইহাকি, মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তার মানে, আল্লাহ তাআলা যে বলেছেন, ফরজ নামাজের পরে তোমরা বেরিয়ে পড়ো, এবং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তালাশ করো। সেই হিসেবে বলা হচ্ছে যে, ফরজ সালাতের পরে জীবিকা অনুসন্ধানের যে তাগিদ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। অর্থাৎ, ফরজের পর আরেকটা ফরজের হুকুম আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা (৮০-১৫০ হিজরি) রহিমাহুল্লাহর ছাত্র, ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানি (১৩২-১৮৯ হিজরি) রহিমাহুল্লাহ। তার একটি বই আছে, মাকতাবাতুল বায়ান থেকে সেটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে—'জীবিকার খোঁজে'। সেখানে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত একটি ধারণা পাবেন। ইসলাম যে দুনিয়াবিমুখতার কথা বলে, সেই দুনিয়া-বিমুখতার সাথে জীবিকা উপার্জন বা ক্যারিয়ারের সমন্বয় সম্পর্কে বইটিতে চমৎকার আলোচনা আছে।

- যেহেতু জীবিকা উপার্জন ছাড়া ফরজ দায়িত্ব পালন করা যায় না; সেহেতু জীবিকা উপার্জন ফরজ। ঠিক যেভাবে সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা অর্জন ফরজ।[৩০]

- মুমিনের দেহ হলো তার বাহন, সে যেন বাহনের সাথে উত্তম আচরণ করে।[৩১]

অর্থাৎ, আমার এই দেহকে সুস্থ-সবল রাখার জন্য, এই দেহ যদি অসুস্থ হয়ে যায়, এটিকে সুস্থ করার জন্য আমাকে জীবিকা উপার্জন করতে হবে। এই বাহনের সাথে ভালো আচরণ করতে হবে। খাদ্য-পোশাক-আবাস দিতে হবে। সেটা ফ্রি পাওয়া যায় না, সেজন্য অর্থকড়ি লাগবে। এই টাকার ব্যবস্থাটা আমরা দুইভাবে করতে পারি।

---

[৩০] কিতাবুল কাসব লি মুহাম্মাদ আশ-শাইবানি, পৃষ্ঠা ৭৩।

[৩১] মুসনাদে আহমদ হাদিস : ৬৬৩৯।

- হয় আমাকে কারও কাছ থেকে ডাকাতি করতে হবে, কারও কাছ থেকে ছিনতাই করতে হবে, দোকানপাট লুট করতে হবে।
- অথবা আমাকে জীবিকা উপার্জন করে, টাকা কামাই করে, সেটা দিয়ে দোকানে গিয়ে কিনতে হবে।

প্রথম রাস্তা হলো হারাম, আর হালাল রাস্তা হলো, জীবিকা উপার্জন করা। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইসলামে জীবিকা অনুসন্ধান করা ফরজ একটি আমল।

কতটুকু ফরজ

যেটুকু জীবিকা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, সেটুকু উপার্জন ফরজ। এখন কথার কথা, আমাকে গাড়ি কিনতে হবে, বাড়ি করতে হবে, ঢাকায় দুটো বাড়ি কিনতে হবে, কয়েকটা ফ্ল্যাট নিতে হবে, বছর বছর বিদেশে ঘুরতে যেতে হবে—এই জীবিকা অর্জন করা কি ফরজ? মোটেও না! যেটুকু জীবিকা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, সেটুকু উপার্জন করা ফরজ। সেটা কতটুকু?

১. নিজের খাবার ও পোশাক

মৌলিক চাহিদা যেটাকে বলে আরকি। আধুনিক মৌলিক চাহিদা বলতে বোঝায়, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিক চাহিদা

হচ্ছে, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্ত্রী বা জীবনসঙ্গিনী, বাহন।[৩২] তাহলে প্রথমে হলো, নিজের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা, এর মধ্যে বিবাহ-শাদিও আছে, যানবাহন আছে, মোটরসাইকেল বা সাইকেল হতে পারে। বা আমরা যারা গণপরিবহণে যাতায়াত করি, পরিবহণের ভাড়াটা হতে পারে। এগুলো হচ্ছে ফরজ পরিমাণ।

২.ঋণ শোধ

যদি কোনো ঋণ থাকে আমার ওপরে, সেই ঋণ শোধ করাও আমার ফরজ উপার্জনের মধ্যে পড়ে। এটার জন্য যদি আমি ইনকাম করি, সেটাও ফরজ ইনকাম।

৩. স্ত্রী-সন্তানের খরচ

স্ত্রী-সন্তান-দাসের ভরণপোষণ পুরুষের ওপর ওয়াজিব। এবং পুরুষের একার ওপরই ওয়াজিব। এখানে স্ত্রীর কোনো দায়দায়িত্ব নেই। সুতরাং স্ত্রীর যে মৌলিক চাহিদা, তার খাবারদাবার, পোশাক-আশাক এবং সন্তানের যে মৌলিক চাহিদা, সন্তানের পড়ালেখা, চিকিৎসাখরচ থেকে শুরু আরও বিভিন্ন বিষয়-আশয়—এ সবকিছু ফরজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

---

[৩২] যদিও ইসলামের এ সংক্রান্ত ধারণাটি আরও ব্যাপক ও সমাজের নানা স্তর বিস্তৃত। পাঠকের ধারণার জন্য শুধু শিরোনামগুলো উল্লেখ করছি। বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি না।
প্রথমত ইসলাম মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে।
ক. যরুরিয়্যাত তথা এমন প্রয়োজন, যা না হলে প্রাণ রক্ষা পায় না।
খ. হাজিয়্যাত তথা এমন প্রয়োজন, যা না হলে পেরেশানিমুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপন করা যায় না।
গ. তাহসিনিয়্যাত তথা এমন প্রয়োজন, যা হয়ে গেলে, জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।
এরপর এগুলো কোনটা কোনস্তরে কতটুকু পরিমাণ লাগবে, এরও প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আছে। আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। এর পাশাপাশি ইসলাম আরও পাঁচটিভাগে মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে। যথা :
ক. হিফজুদ-দীন তথা দীন সংরক্ষণ।
খ. হিফজুন নাফস তথা প্রাণ সংরক্ষণ।
গ. হিফজুল আকল তথা মস্তিষ্ক সংরক্ষণ।
ঙ. হিফজুন নাসল তথা বংশধারা সংরক্ষণ।
চ. হিফজুল মাল তথা সম্পদের সংরক্ষণ।

৪. বয়স্ক পিতামাতার খরচ

অর্থাৎ, নির্ভরশীল অন্যান্য যারা আছেন, যেমন বয়স্ক পিতামাতা। তাদের যে খরচটা, মৌলিক চাহিদাসহ আরও অন্যান্য বিষয়-আশয়, সেই খরচটাও ফরজ উপার্জনের মধ্যে শামিল।

এই পুরো জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ফরজ পরিমাণ ইনকাম। এখন ফরজ পরিমাণ ইনকাম যখন আমার হয়ে গেল, এরপরে দিনের বাকি সময়টা কি আমি আরও ইনকাম করব? নাকি আমি বাকি সময়টা ইবাদতের পেছনে দেবো? এর ব্যাপারে আলেমগণ বলেছেন, ফরজ জীবিকা অর্জনের পর, বাকি সময় ইবাদতে ব্যয় উত্তম। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"রাব্বানা আতিনা ফিদ-দুনইয়া হাসানাহ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।" দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করি। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, ফরজ জীবিকা উপার্জন যখন হয়ে গেল, এরপর দিনের বাকি সময় আরও জীবিকা কামাই করার ধান্দায় না থেকে ইবাদতে ব্যয় করাই উত্তম। কিন্তু অতিরিক্ত ইনকামেরও সুযোগ আছে। একেবারে নেই যে, তা না। তবে ইবাদত করাটা উত্তম।

ইমাম গাজালি (৪৫০- ৫০৫ হিজরি) রহিমাহুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি খুব টাকাপয়সা উপার্জন করছিল। তাকে সবাই দুনিয়াদার বলছে, এবং এরকম কথা বলছে যে, সে যদি অতিরিক্ত এত ইনকাম না করে বাকি সময়টা আল্লাহর রাস্তায় কাটাত, তাহলে কতই-না ভালো হতো। রাসুলের একটা হাদিসের মর্ম এমন—

> যখন তোমার সামনে বলা হচ্ছে, "অমুকে অনেক ইনকাম করছে, ইনকামের পেছনে অনেক সময় ব্যয় করছে। সবচেয়ে ভালো হতো, যদি সে ইনকামটা না করে আল্লাহর রাস্তায় সময় দিত।" নবিজি বলেন যে, "তোমরা এরকম বলো না। কেননা, যদি সে মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাজকর্ম করে, তবে সে আল্লাহর রাস্তায়ই রয়েছে। (অর্থাৎ, ফরজ পরিমাণ উপার্জন) আর যদি সে নিজের বৃদ্ধ পিতামাতা ও দুর্বল শিশুদের জন্য কাজকর্ম করে, যাতে তারা অভাবগ্রস্ত না হয়, তবুও সে আল্লাহর রাস্তায়ই রয়েছে।"[৩৩]

---

[৩৩] ইমাম গাজালি, ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৩০৬

ঈসা আলাইহিস সালামের একটি কাহিনি আছে। এক ব্যক্তি তার কাছে এলো। ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী করো? লোকটি বলল, আমি আল্লাহর ইবাদত করি। তিনি বললেন, তাহলে তোমার যে খরচাপাতি আছে, এগুলো কে চালায়? লোকটি জবাব দিলো, আমার ভাই চালায়। তখন ঈসা আলাইহিস সালাম জবাব দেন, তাহলে তো দেখছি তোমার ভাই-ই তোমার চেয়ে বেশি ইবাদত করে। যেহেতু তোমার খরচাপাতিগুলো সে চালাচ্ছে। সে জীবিকার পেছনে সময় দিচ্ছে, আর তুমি এখানে আল্লাহর ইবাদত করছ। তাহলে তো তোমার ভাই-ই আল্লাহর ইবাদত বেশি করছে। সে নিজেও চলছে, তোমাকেও চালাচ্ছে।[৩৪]

তাহলে আমরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ করলাম যে, ফরজ পরিমাণ জীবিকা উপার্জন করা, এটা আল্লাহর রাস্তায় থাকার মতো এবং এটা এক বিরাট বড় নেক আমল। মোটেই এমন না যে, আমি দুনিয়ার প্রয়োজন পুরা করছি বলে এগুলো বেকার হয়ে গেছে। বিলকুল তা নয়, বরং এটা একটা বড় নেক আমল। এবং এর জন্য আল্লাহর দরবারে সওয়াব পাওয়া যাবে।

আরেকটা হাদিস লক্ষ করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিজের স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়া, এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম সদকা।"[৩৫] এর মানে, স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য, স্ত্রীর খায়খরচের জন্য আপনি যে ব্যয়টা করবেন, এই ব্যয়টা সদকার সমান। সুতরাং জীবিকা উপার্জন করা এক তো হলো ফরজ। কেউ যদি উপার্জন না করে বসে থাকে, তাহলে সে কবিরা গুনাহের মধ্যে পড়ল। এবং সেইসাথে যদি কেউ উপার্জন করে, তাহলে এটা একটা বিরাট বড় নেক আমল হচ্ছে। ফরজের পরে সে এক বিরাট নফল আমলও করছে, সুবহানাল্লাহ।

নবিদের (আলাইহিমুস সালাম) জীবিকা

নবিদেরকে (আলাইহিমুস সালাম) তো আল্লাহ তাআলা দ্বীনের দাওয়াতের জিম্মাদারি দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তাঁদেরও জীবিকা ছিল। তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা বস্তুগত জীবিকা অর্জন করতে বলেছেন। অর্থাৎ, দাওয়াতের পাশাপাশি

---

[৩৪] ইমাম মুহাম্মাদ রহ., আল-কাসব (জীবিকার খোঁজে, মাকতাবাতুল বায়ান)

[৩৫] সহিহুল বুখারি : ২৭৪২; সহিহ মুসলিম : ১৬২৮; সুনানু আবি দাউদ : ২৮৬৪

নিজের রুজি নিজেকে অর্জন করার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। দেখুন, তারা কিন্তু চাইলেই বলতে পারতেন, হে আল্লাহ, আমার ঘরে খাবার নেই, আমায় খাবার দেন। আল্লাহ অবশ্যই পাঠিয়ে দিতেন। তারা যদি বলতেন, হে আল্লাহ, আমার কিছু টাকাপয়সা দরকার, তাহলেও আল্লাহ তাআলা টাকাপয়সা পাঠিয়ে দিতেন। আমাদের নবিজিকে আল্লাহ দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত ধনভান্ডারের চাবি দিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৬] কিন্তু আল্লাহ তাআলা হুকুম দিয়েছেন এটা, আমাদেরকে শেখানোর জন্য। আমরা যেন কাজকর্ম অর্থাৎ জীবিকা উপার্জন ছেড়ে দিয়ে ইবাদতে বসে না যাই। এইজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শেখানোর জন্য, নবিদেরকেও দুনিয়াতে জীবিকা করে উপার্জনের আদেশ দিয়েছেন; যারা আল্লাহর কাছে চাইলেই সবকিছু পেয়ে যেতে পারতেন।

নবি	পেশা
আদম আ.	কৃষি
নুহ, জাকারিয়া আ.	কাঠমিস্ত্রী
ইদরিস আ.	দরজি
ইবরাহিম আ.	বস্ত্র ব্যবসায়ী
দাউদ আ.	বর্ম তৈরি
সুলাঈমান আ.	তালপাতার ঝুড়ি তৈরি
ঈসা আ.	চরকায় সুতা কাটা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "তোমরা যা খাও তার মাঝে সর্বোত্তম হলো ওই খাবার, যা তোমরা নিজের হাতে উপার্জন করো। আমার ভাই দাউদ নিজের হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[৩৭]

দাউদ আলাইহিস সালামের কাজ ছিল, বর্ম তৈরি করা। কুরআনের মধ্যে কিন্তু এই আয়াতটা আছে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, দাউদের জন্য আমি লোহাকে নরম করে দিয়েছি। মানে, দাউদ আলাইহিস সালাম লোহায় হাত দিলেই তা আটার খামিরের মতো নরম হয়ে যেত। এক তো তিনি নবি ছিলেন, রাসুল ছিলেন আবার ইসরাইলের বাদশাহও ছিলেন, এবং তিনি লোহার বর্মও তৈরি করতেন। সেই পোশাক তৈরি করে তিনি নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন।

[৩৬] সহিহুল বুখারি : ২৯৭৭; সহিহ মুসলিম : ৫২৩; সুনানুন নাসায়ি : ৪২৮০

[৩৭] বুখারি, ৪/৩০৩

ঈসা আলাইহিস সালামের জীবিকা ছিল, চরকায় সুতা কাটা।[৩৮] ঈসা আলাইহিস সালামের মা, মারইয়াম আলাইহিস সালামের একটা চরকা ছিল, সুতা কাটার জন্য। পশুর লোম থেকে পশমি সুতা তৈরি করা। তো, এটাই ছিল তার জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম।[৩৯]

তার মানে বোঝা গেল, নবিদেরকে—যারা আল্লাহর কাছে হাত পাতলেই পেয়ে যান; এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানুষদেরকেও আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করতে শিখিয়েছেন। এবং তারা তাদের যে মূল দায়িত্ব, অর্থাৎ, দাওয়াতের কাজের পাশাপাশি নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জন করতেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিকা

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস,

> আমি সম্পদ জমা করব ও ব্যবসায়ী হব, এজন্য আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়নি। বরং আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়েছে, "তোমার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করো; সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও; এবং চরম নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আসার আগ পর্যন্ত তোমার রবের গোলামি করতে থাকো।"[৪০]

অর্থাৎ, আমার কাছে ওহি মানুষকে ব্যবসা শেখানোর জন্য পাঠানো হয়নি। মানে ব্যাপারটা হলো, আমি ওহির মাধ্যমে মানুষকে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে নেব। কিন্তু এই ওহির মাধ্যমে আমাকে ব্যবসা করতে বলা হয়নি।

এখানে অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করেন। তারা বলেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুনিয়াবি কোনো পেশা ছিল না। 'আমি সম্পদ জমা করব ও ব্যবসায়ী হব, এজন্য আমার কাছে ওহি পাঠানো হয়নি।' এর মানে হলো, 'ওহি পাঠিয়ে' আমাকে বলা হয়নি যে, আপনি সম্পদ জমা করুন বা ব্যবসায়ী হোন। ওহি পাঠানোর উদ্দেশ্য দুনিয়ার কামাই না। বরং ওহি পাঠানো হয়েছে আখেরাতের কামাই বাতলানোর জন্য। যেন আমি নিজের রবের প্রশংসা করি, সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং রবের গোলামি করতে থাকি। ওহি পাঠিয়ে এই কথাগুলোই আমাকে বলা হয়েছে।

---

[৩৮] কিতাবুল কাসব, পৃষ্ঠা : ৭৫-৭৯

[৩৯] কিতাবুল কাসব, পৃষ্ঠা ৭৮

[৪০] আয-যুহদ লিল আহমদ, আবু মুসলিম খাওলানির সূত্রে

অর্থাৎ ওহি পাঠানোর উদ্দেশ্য কী, সেটা বলা হাদিসের উদ্দেশ্য। নয়তো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের ব্যবসা ছিল, এবং তিনি সম্পদও জমা করেছেন। সেটা আমরা সামনে দেখব। তার মানে, এই কথা ওহির সাথে খাস। অর্থাৎ, ওহি আসার উদ্দেশ্য আমাকে এগুলো বানানো নয়। বরং আখেরাতমুখী করার জন্য।

আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম—

১. প্রথম জীবনে মেষের রাখাল ছিলেন। একসময় খাদিজা রা.-এর ব্যবসাও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামলাতেন। পরবর্তী সময়ে আম্মা খাদিজার সম্পদই ছিল তাঁর জীবিকানির্বাহের বড় একটা মাধ্যম। নবুয়তের পর...

২. তিনি চামড়ার কারবারে অংশীদার ছিলেন।[৪১] সাহাবিগণ রা. ব্যবসা করতেন, আর রাসুল ইনভেস্ট করতেন এবং সেখান থেকে লাভ গ্রহণ করতেন।

৩. 'জুরফ' নামক একটি এলাকায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বীজ বপন করাতেন। সেখান থেকে তাঁর ফসল আসত। এটা দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবিকা এবং এগারোটা সংসারের জীবিকা উপার্জন করতেন। অর্থাৎ, চামড়ার কারবার ও জুরফের বীজের ফসল থেকে তিনি জীবিকা উপার্জন করতেন। আর সেইসাথে হাদিয়া তো আছেই। এবং যুদ্ধের গনিমতের মালামাল থেকেও কিছু আসত।

সাহাবিদের জীবিকা

আম্মাজান আয়িশা রা. বলেন,

> আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিগণ শারীরিক শ্রম দিয়ে উপার্জন করতেন।[৪২]

সাহাবিদের প্রত্যেকের জীবিকা ছিল। যারা সুফিবাদের নামে বলছে যে, কোনো দুনিয়াবি পেশা আমরা গ্রহণ করব না। অথচ দেখুন, সাহাবিদের চেয়ে

---

[৪১] আবু দাউদ সূত্রে ইমাম মুহাম্মাদ রহ., প্রাগুক্ত।

[৪২] সহিহুল বুখারি, ২০৭১

বড় আল্লাহওয়ালা, বড় বুজুর্গ তো আর কেউ ছিলেন না। সাহাবিদের চেয়ে বড় বুজুর্গ হওয়া সম্ভবও না। সেই সাহাবিদের প্রত্যেকের জীবিকা ছিল। জীবিকাহীন জীবন কাটানোর দলিল হিসেবে আসহাবে সুফফার সাহাবিগণ বিশেষ করে আবু হুরাইরা রা.-কে বারবার সামনে আনা হয়। সেই আবু হুরাইরা রা.-ও জীবিকা নিজে উপার্জন করতেন। আসহাবে সুফফার প্রত্যেকে গভর্নর ও সরকারি আমলা হয়েছিলেন পরবর্তী জীবনে, সরকারি ভাতা পেতেন। সুতরাং জীবিকা উপার্জনকে দ্বীনদারির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ইসলামসম্মত কথা নয়।

উমর রা. একবার মসজিদে কিছু লোক দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? বলা হলো, এরা তাওয়াক্কুলকারী। এরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে থাকে, জিকির-আজকার করে, ইবাদত-বন্দেগি করে। তখন উমর রা. বললেন, এরা কিছুতেই তাওয়াক্কুলকারী নয়। বরং এরা তো বসে বসে খাওয়ার লোক।... প্রকৃত তাওয়াক্কুলকারী তো সে, যে জমিতে বীজ বপন করার পর, রবের ওপর ভরসা করে।[৪৩]

তার মানে, দুনিয়াবি কোনো আয়-উপার্জনের ধান্দা করব না—এটা না রাসুলের শিক্ষা, না সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা। এমনকি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির মাঝে ছয়জন তাদের যুগের শীর্ষ ধনী ছিলেন।

- আবু বকর রা. বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন।
- উমর রা. চামড়ার ব্যবসায়ী ছিলেন। খাইবারে উমর রা.-এর একখণ্ড জমি ছিল, নাম ছিল সামগ (Thamgh)। সেই জমি থেকে তার উপার্জন আসত।
- উসমান রা. খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী ছিলেন।
- আলি রা.-ও ব্যবসা করতেন, পাশাপাশি কায়িক শ্রমও দিতেন। তাদের সংসারে যখন খুব অভাব ছিল, তখন তিনি এক ইহুদির কাছ থেকে অল্প কয়েকটি খেজুরের বিনিময়ে কূপ থেকে পানি তুলতেন। যখন মুহাজির সাহাবিদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, তখন তারা এই কাজগুলোও করতেন।

---

[৪৩] আল-ইকদুল ফারিদ, ২/৩৪২; ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ২/৬২

- খাইবারে উমর রা.-এর একখণ্ড জমি ছিল, নাম ছিল সামগ (Thamgh)। সেই জমি থেকে তার উপার্জন আসত।

- সাওয়াদ এলাকায় (দক্ষিণ ইরাক) ইবনু মাসউদ রা., হাসান রা. ও আবু হুরাইরা রা.-এর শস্যক্ষেত ছিল। সেখানে তারা মানুষ দিয়ে চাষাবাদ করাতেন এবং সেখান থেকে খাজনা আদায় করতেন।

- সাওয়াদ এলাকায় ও অন্যান্য জায়গায় ইবনে আব্বাস রা.-এর শস্যক্ষেত ছিল। সেসব স্থান থেকে তার আয়-উপার্জন আসত।

- সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা.-এর ছিল তির-বর্শার ব্যবসা।

Map of Medina

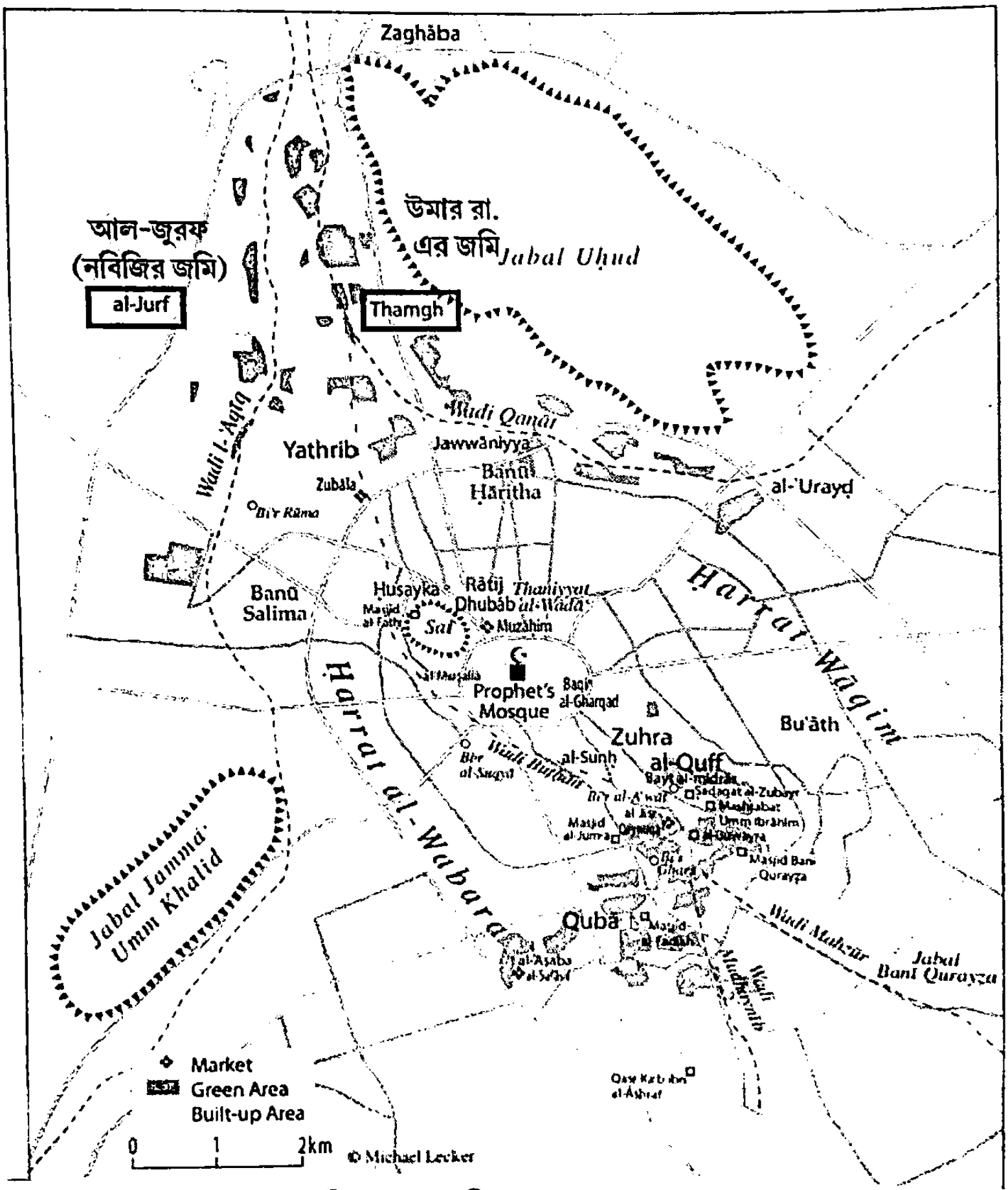

একটি হাদিসে আমরা পাই, যেখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "যখন তোমরা কৌশলে সুদ খাবে, এবং গরুর লেজ ধরে চাষের ভূমিতে যাওয়া শুরু করবে। তখন তোমাদের ওপরে আল্লাহ অপমান চাপিয়ে দেবেন। আজাব হিসেবে তোমাদের ওপর অপমান-জিল্লতি-অত্যাচার চাপিয়ে দেবেন।"[৪৪]

কিন্তু এই হাদিসের ব্যাপারে আলেমগণ বলছেন, চাষাবাদের নিন্দায় যে হাদিসগুলো এসেছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য 'চাষাবাদ' না। বরং 'একটি জাতির সকল লোক জিহাদবিমুখ হয়ে চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়া'। অর্থাৎ, কোনো জাতির সকল মানুষ যখন জিহাদ থেকে বিমুখ হয়ে এসব দুনিয়াবি কাজকারবার ও ক্যারিয়ারের মধ্যে লিপ্ত হবে, (সেটি চাষাবাদ হতে পারে, ব্যবসাবাণিজ্য, চাকরি হতে পারে) তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন। ঠিক আজকের দিনে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর মানে চাষাবাদকে নিরুৎসাহিত করা নয়, বরং চাষাবাদ করা ফরজে কিফায়া।

> "যৌথ বা ব্যক্তিগতভাবে চাষাবাদ করা ফরজে কিফায়া। কেননা এতে মানুষ ও প্রাণীর (জীবনধারণের) প্রয়োজন আছে।"[৪৫]

সুতরাং, আমাদের নবি-রাসুল ও সাহাবিগণ তাদের প্রত্যেকেরই জীবিকা ছিল। কারণ আল্লাহ তাআলা এটাকে ফরজ করেছেন। আসুন, সাহাবিদের জীবনযাপনের ধরনটা কেমন ছিল, তা দেখি। তাহলে ক্যারিয়ার ব্যাপারটার সাথে আমরা রিলেট করতে পারব।

সাহাবিদের জীবনযাপনের ধরন

- এক সাহাবি বলেন, আমাকে খুবই পুরাতন পোশাক পরে থাকতে দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্ন করলেন, তোমার ধনদৌলত আছে? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে উট, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি সকলপ্রকার সম্পদই দিয়েছেন। তিনি বললেন, তা তোমার শরীরে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। মানে, আল্লাহ যে তোমাকে

---

[৪৪] সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৬২; মুসনাদু আহমাদ : ৫৫৬২; বাইহাকি : ১০৪৮৪; হাদিসটি সহিহ

[৪৫] আল-ফিকহ আলাল মাজাহিবিল আরবাআ : ৩/১২

সচ্ছলতা দিয়েছেন, সেটা তোমার পোশাক-আশাকে ফুটে ওঠা উচিত।[৪৬] মানে একদম জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় থাকা, এটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দ করেননি।

- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সুহরাতাইন' পরতে নিষেধ করেছেন, মানে, এত জীর্ণ পোশাক না পরা, যাতে লোকেরা আঙুল উঁচিয়ে কানাঘুষা করে। আবার এত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক না পরা, যাতে আঙুল তুলে কানাঘুষা করে।[৪৭] তার মানে দাঁড়াল, ইসলাম হলো ব্যালেন্স। মানে, মাঝামাঝি। আল্লাহ তাআলা কুরআনের মধ্যে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৪৮]

- হজরত ইবনে উমর রা. বলেন, এমন কাপড় পরবে, যাতে বেকুবেরা তোমাকে তুচ্ছ মনে না করে (যারা কাপড় দেখে মানুষকে মূল্যায়ন করে); আবার এত জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরো না, যাতে ধৈর্যশীলরাও তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হয় (মনে না করে, তুমি দুনিয়াদার)। 'কেমন সেটা' জানতে চাইলে বললেন, ৫ থেকে ২০ দিরহামের কাপড়।[৪৯]

- আলি রা. ৩-৪ দিরহামের কাপড় পরেছেন, আবার ইবনে আওফ রা. ৪০০-৫০০ দিরহামের কাপড় পরেছেন, আবার ইবনে আব্বাস রা. ১০০০ দিরহামের কাপড়ও কিনেছেন।

- আল্লাহর রাসুল বলেছেন, সৌভাগ্যের বিষয় তিনটি—নেককার স্ত্রী, দ্রুতগামী বাহন, কয়েক স্তরের প্রশস্ত কামরা।[৫০] অর্থাৎ, বড় ঘর, বড় বাসা, যেখানে মহিলাদের পর্দার হেফাজত হয়, যেখানে বড় পরিবার থাকা যায়; এরকম বাসা থাকা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করা হয়।

আমরা এর মাধ্যমে সাহাবিদের লাইফস্টাইল সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম

---

[৪৬] সুনানু আবি দাউদ : ৪০৬৩; সুনানুত তিরমিজি : ২০০৬; সুনানুন নাসায়ি : ৫২২৪; হাদিসটি সহিহ

[৪৭] ইমাম মুহাম্মাদ রহ., প্রাগুক্ত।

[৪৮] সুরা বাকারা : ১৪৩

[৪৯] বাইহাকির সূত্রে জামিউস সগির, ইমাম সুয়ুতি। 'জীবিকার খোঁজে', ইমাম মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহ, মাকতাবাতুল বায়ান, পৃষ্ঠা ১০৫।

[৫০] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস : ২৬৮৪, সূত্রে, আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০ উপদেশ, শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ রহ., রুহামা পাবলিকেশন।

যে, কী ধরনের লাইফস্টাইল আমাদের মেইনটেইন করা প্রয়োজন। মাঝামাঝি ধরনের লাইফস্টাইল অবলম্বন করা ইসলামের মেজাজ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা বিখ্যাত হাদিস আছে, "সাদাসিধা জীবন ঈমানের অঙ্গ।"[৫১] আর সাহাবিরা সাদাসিধা জীবনযাপন করার চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ, মাঝামাঝি জীবনযাপন। খুব জীর্ণশীর্ণও না, আবার জাঁকজমকপূর্ণও না।

সঞ্চয়

সঞ্চয় না করার দলিল হিসেবে একটা হাদিস বেশ প্রসিদ্ধ। বেলাল রা. একবার কিছু খেজুর জমা করছিলেন, তখন আল্লাহর রাসুল বলেছেন,

> "হে বেলাল, কালকের দিনের জন্য কিছু জমা রেখো না। তুমি যদি প্রশস্ত-হস্তে দান করো, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে সেভাবে দান করবেন।"[৫২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমদিকে সঞ্চয় করতে নিষেধ করতেন, যখন সাহাবিদের মাঝে অভাবী মানুষ বেশি ছিল। পরে যখন সাহাবিদের মাঝে আমভাবে সচ্ছলতা এসে গেল, তিনি তাঁর পোষ্যদের জন্য এক বছরের খাদ্য মজুদ করেছিলেন।[৫৩] রাসুলের যে বিরাট পরিবার, এগারোজন আম্মাজান আছেন, তাদের জন্য একবছরের পরিমাণ খাবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজুদ করেছিলেন। এতে বোঝা গেল, পরিবারের জন্য সঞ্চয় করা খারাপ কিছু নয়।

১.

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. যখন রোগাক্রান্ত হলেন, তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে এলেন। সাদ রা. বললেন,

– আল্লাহর রাসুল! আমার অবস্থা তো আপনি দেখছেন। আমার কিছু সম্পদ আছে। আর ওয়ারিশ হিসেবে আছে কেবল এক কন্যা। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দান করব?

– না।

---

[৫১] সুনানু আবি দাউদ : ৪১৬১; মিশকাতুল মাসাবিহ : ৪৩৪৫; হাদিসটি সহিহ

[৫২] মুসনাদুল বাযযার : ১৯৭৮; সহিহুল জামি : ১৫১২; হাদিসটি সহিহ

[৫৩] সহিহুল বুখারি : ৫৩৫৭; সহিহুল জামি : ৪৮৯৬

– তবে অর্ধেক?

– না।

– তবে এক-তৃতীয়াংশ?

– এক-তৃতীয়াংশ (করা যায়, তবে তাও) অনেক। তুমি তোমার ওয়ারিশদের অন্যের কাছে হাত পাতার মতো অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদেরকে সহায়সম্বল দিয়ে রেখে যাওয়া উত্তম।[৫৪]

■ সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. অর্থনৈতিকভাবে এতটা সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন যে, আল্লাহর রাসুল তাকে সঞ্চয় করার উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, আপনার মৃত্যুর পরে, তারা যেন পথে বসে না যায়।

২.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা দোয়া পড়তেন,

> "হে আল্লাহ, বার্ধক্যে ও জীবনের শেষলগ্নে আমার জীবনোপকরণে প্রশস্ততা দিয়ো।"[৫৫]

মানে, শেষজীবনে আমি যেন অভাবে না পড়ি। এর মানে বুঝতে পারলাম, সঞ্চয় করা, পরিবারের জন্য কিছু সঞ্চয় করার জন্য আয়-রোজগার করাও খারাপ নয়। এই পরিমাণ সঞ্চয় রাখা যে, আমার যদি হঠাৎ করে মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে আমার স্ত্রী-সন্তানকে যেন রাস্তায় বসে যেতে না হয়। মানুষের কাছে ধারদেনা চাইতে যেন না হয়। এইজন্য কিছু সঞ্চয় করা, এটাও শরিয়তে বৈধ।

সঞ্চয় ও অতিরিক্ত আয়ের প্রয়োজনীয়তা

১.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

> "ওপরের হাত নিচের হাতের তুলনায় উত্তম। ওপরের হাত হলো দাতার হাত।

---

[৫৪] সহিহুল বুখারি : ২৭৪২; সহিহ মুসলিম : ১৬২৮; সুনানু আবি দাউদ : ২৮৬৪

[৫৫] আল-মুসতাদরাক, হাকিম : ১৯৮৭; আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৩৬১১; হাদিসটি হাসান

আর নিচের হাত গ্রহীতার হাত।”[৫৬]

এর মানে, তিনি দানখয়রাত করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। দান করতে হলে, আপনাকে ফরজ পরিমাণ প্লাস ভবিষ্যতের সঞ্চয় করে আরও কিছু অতিরিক্ত আয় করতে হবে।

২.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনুল আস রা.-কে বলেন,

“আমি তোমাকে সম্পদ উপার্জনের নির্দেশ দিচ্ছি। সৎ মানুষের কাছে হালাল সম্পদ থাকা অতি উত্তম। কারণ তা দিয়ে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে।”[৫৭]

অর্থাৎ, তাদের আমরা দানখয়রাত করব। আমি যেহেতু দ্বীনকে বুঝেছি। আল্লাহকে ভয় করি, আল্লাহর রাসুলের শরিয়ত অনুযায়ী চলি। সুতরাং আমার কাছে যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তাহলে তা সমাজকল্যাণে ব্যয় হবে। দ্বীনের প্রয়োজনে ব্যয় হবে, মসজিদে-মাদরাসায় ব্যয় হবে। যেহেতু দাতার হাত গ্রহীতার হাতের তুলনায় উত্তম, সুতরাং আমার হাত যেন দাতার হাত হয়, গ্রহীতার হাত না হয়।

প্রসঙ্গত আরেকটি আলাপের অবতারণা করি। একটা দেশে কী পরিমাণ ব্যাংকনোট থাকবে, তা মোটামুটি ফিক্সড। দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার হিসাব করে প্রতিবছর কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট ছাপে। এ ছাড়া এখন এই মুহূর্তে পুরো দেশে কী পরিমাণ নোট আছে, তা কমবেশি স্থির। এই নোটগুলোই হাতবদল হয়। আমরা যারা দ্বীনকে বুঝেছি, আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখি, আমরা যদি এই নোটগুলো নিই, তবে দ্বীনের জন্য খরচ হবে। যদি ছেড়ে দিই, তবে বদ লোকেরা এসব খরচ করবে বদ কাজে। এটা আরেকটি বাস্তবতা বললাম। যদিও এটিও তকদিরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চেষ্টার আদেশ তো সর্বদা রয়েছেই।

৩.

- আরেকটা হাদিস, “দারিদ্র্য কুফর বা অকৃতজ্ঞতার অনেক কাছাকাছি

---

[৫৬] সহিহুল বুখারি : ১৪২৭; সহিহ মুসলিম : ১০৩৩; সুনানুত তিরমিজি : ৬৮০

[৫৭] আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৯৯; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৭৬৩; আল-মাবসুত লিস-সারাখসি : ৩০/২৫৭; ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদিসটি সহিহ

অবস্থান করে।"[৫৮]

এতে বোঝা গেল, ইচ্ছাকৃতভাবে গরিব হয়ে যাওয়া উচিত হবে না। এটা অনেক সময় কুফরের দিকে পৌঁছে দেয়।

সুতরাং—

প্রথমত, ফরজ পরিমাণ আয়,

দ্বিতীয়ত, নিজের বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছুটা সঞ্চয়,

তৃতীয়ত, আমার মরণের পর পরিবার যেন হাত পাতার অবস্থায় না পড়ে, সেজন্য আরেকটু কিছু।

চতুর্থত, কিছুটা অতিরিক্ত আয়; যাতে করে আমি দান-সদকা করতে পারি; হজে যাওয়ার জন্য কিছু টাকা জমিয়ে রাখতে পারি।

এই পরিমাণ উপার্জন করতে শরিয়ত আমাদের উৎসাহিত করেছে। কিন্তু এই সবকিছু আবর্তিত হবে সাদাসিধে মধ্যপন্থী জীবনকে কেন্দ্র করে।

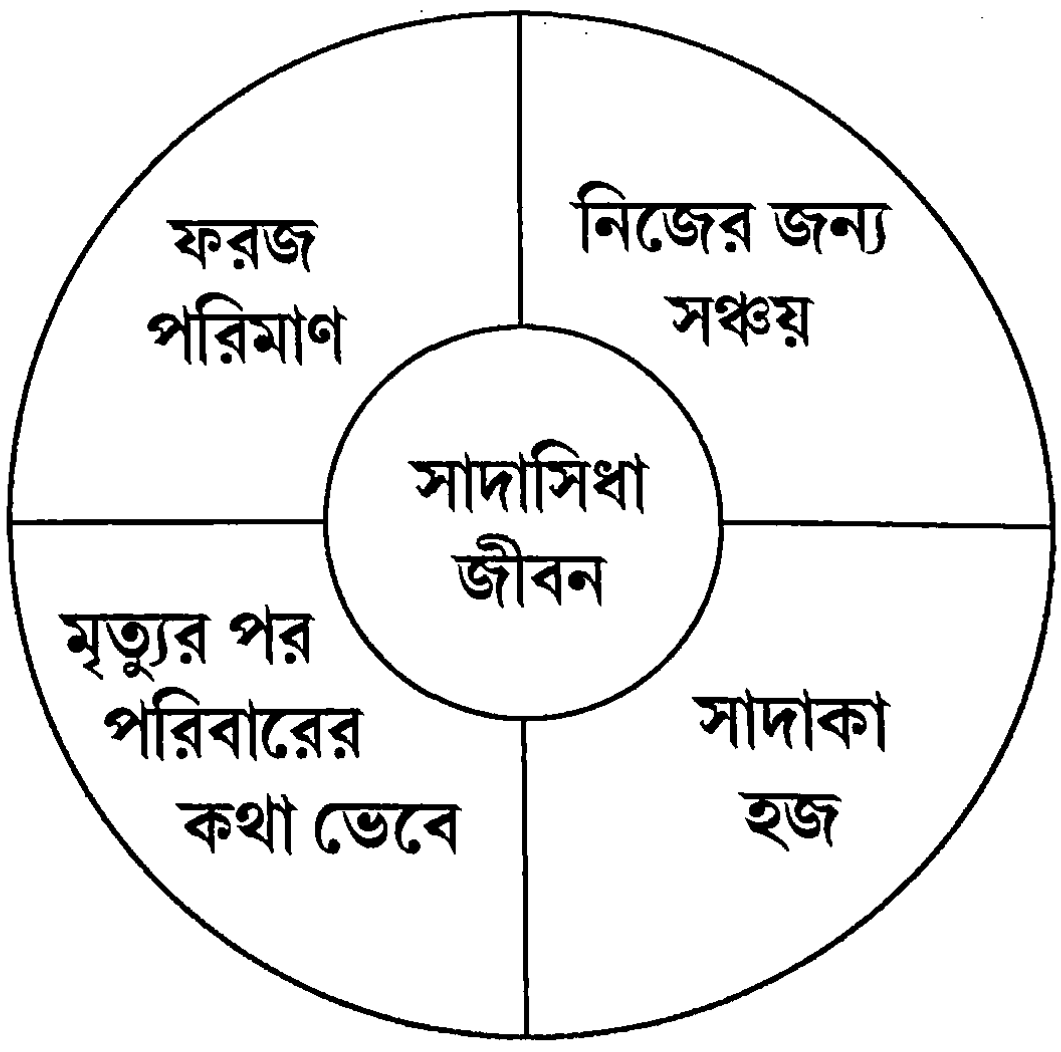

মুমিনের আয়

[৫৮] মিশকাতুল মাসাবিহ : ৫০৫১; আল-জামিউস সগির, সুয়ুতি : ৯৬৩৩; হাদিসটির সনদ দুর্বল

দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি : ইসলামের মূল বার্তা

ইসলামের মূল বার্তা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার বলেছেন, 'দুনিয়া হচ্ছে ধোঁকার ঘর', 'এই দুনিয়া হচ্ছে খেল-তামাশার ঘর'। দুনিয়া আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন, আর আখেরাত আমাদের চিরস্থায়ী জীবন। দুনিয়ার সময়টা আমাদের জন্য একটা পরীক্ষার সেন্টার। এখানে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি। এখানে আমি যেরকম পরীক্ষা দেবো, সেরকম রেজাল্ট পাব। আখেরাতে আমার সেরকম জীবন কাটবে। পরীক্ষা তো তিন ঘণ্টা দিই আর বাকি সারাদিন তো বাইরেই কাটাই। সেরকমই দুনিয়া হচ্ছে একটা পরীক্ষার জায়গা।

এবং দুনিয়া হচ্ছে আমার শস্যক্ষেত্র, এখানে আমি যে পরিমাণ কষ্ট করব, যে পরিমাণ ফসল ফলাব, সেটা আমি আখেরাতে গিয়ে পাব। সুতরাং আখেরাতের জীবনটাই আমাদের আসল জীবন। দুনিয়ার জীবন তো আমাদের অল্প সময়ের ব্যাপার। পরীক্ষা তো তিন ঘণ্টা দিই আর বাকি সারাদিন তো বাইরেই কাটাই। সেরকমই দুনিয়া হচ্ছে একটা পরীক্ষার জায়গা। এখানে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি। আর আখেরাতের জীবনই আমাদের আসল জীবন। সুতরাং, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হওয়ার কিছু নেই। দিলকে দুনিয়ার সাথে লাগিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। বরং দুনিয়াতে আমি অতটুকুই করব, যতটুকু আমার প্রয়োজন। যতটুকু আমার ফরজ পরিমাণ, পাশাপাশি কিছু সঞ্চয় এবং খেদমতের জন্য কিছু অতিরিক্ত আয়। আমার তো দুনিয়াতে বড় বড় বাড়ি, বড় বড় গাড়ি, বিরাট বড় আলিশান ঘরবাড়ি, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপনের প্রয়োজন নেই। কারণ, আমরা তো আখেরাতের পথিক। আখেরাতে আমার প্রাসাদ আছে, সেখানে আমার নহর আছে, না-জানি কত মহল আছে, বিলিয়ন বিলিয়ন হেক্টর জমি আছে, বাগান আছে। আমাদের ভোগের জায়গা হচ্ছে—আখেরাত।

সুতরাং, খুব করে মাথায় গেঁথে নিন—ইসলামের মূল বার্তা কিন্তু এই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি। কিন্তু এই অনাসক্তির অর্থ কী? এর মানে কি বিমুখ, বিরাগী

হওয়া? এর মানে কি ইচ্ছে করে গরিব থাকা? দরিদ্র থাকার পক্ষে দলিল হিসেবে দুটি হাদিস খুব ব্যবহার করা হয়।

১.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছেন,

> "হে আল্লাহ, আমাকে মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রেখো। মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দিয়ো। আর কেয়ামতের দিন মিসকিন লোকদের সাথে পুনরুত্থিত করো।"[৫৯]

ভাবা হয়, এই হাদিস দ্বারা দরিদ্রতাকেই চাওয়া হয়েছে। সুতরাং সম্পদ কাম্য না, দরিদ্রতাই কাম্য। প্রথমত, হাদিসটির সনদ দুর্বল। ইমাম ইবনুল জাওযি, ইবনু তাইমিয়া, ইবনু কাসির, হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. প্রমুখ হাদিসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন।[৬০]

আরেক দল আলেমের মত হিসেবে সহিহ বলে মেনেও যদি নেওয়া হয়, তবে এখানে 'মিসকিন' বলতে অর্থসম্পদহীন দরিদ্র বোঝানো হয়নি, এখানে উদ্দেশ্য 'বিনয়ী ও নিরহংকারী'। ইমাম ইবনু তাইমিয়া বলেন,

> তিরমিজির এই বর্ণনাটি সহিহ হোক বা না হোক, এখানে যে মিসকিনের প্রশংসা করা হয়েছে, তা হলো 'বিনয়ী ও নিরহংকারী'। এখানে মিসকিন শব্দ দ্বারা দারিদ্র্য উদ্দেশ্য না। কেননা কখনো তো এমনও হয়, একজন দরিদ্র হয়েও অহংকারী।... সুতরাং মিসকিন হওয়া অন্তরের একটি বিষয়। আর তা হলো, অহংকারের বিপরীতে নম্র ও বিনয়ী হওয়া।[৬১]

ইমাম বাইহাকির বক্তব্য উদ্ধৃত করে ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন,

> এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন মিসকিন হওয়ার জন্য দুআ করেননি, যার অর্থ দরিদ্র হওয়া। বরং তিনি প্রার্থনা করেছেন এমন মিসকিন হওয়ার জন্য, যার অর্থ বিনয় ও নম্রতা।[৬২]

এমনকি আভিধানিক অর্থও তাই বলে। ইমাম ইবনু মানযুর রহ. বলেন,

---

[৫৯] সুনানুত তিরিমিজি : ২৩৫২; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১২৬; হাদিসটি সহিহ

[৬০] আল-মাওযুআত : ৩/১৪২; শারহু মুহাযযাব : ৬/১৯৬; মাজমুউল ফতওয়া : ১৮/৩৫৭; তালখিসুল হাবির : ৩/১০৯

[৬১] মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৮/৩২

[৬২] তালখিসুল হাবির : ৩/১০৯

মিসকিন শব্দটির মূল অর্থ হলো বিনয়ী, নিরহংকারী। আর ফকির শব্দের মূল অর্থ হলো মুখাপেক্ষী। এজন্যই হাদিসে এসেছে, "হে আল্লাহ, আমাকে আপনি মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন।"[৬৩] এখানে মিসকিন হওয়া দ্বারা তিনি বিনয়ী, নম্র ও নিরহংকারী হওয়া বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, হে আমার রব, আমাকে আপনার সামনে বিনীত, দুর্বল ও নিরহংকারী অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখুন। এখানে মিসকিন বলতে দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী (ফকির) বলা হয়নি।

সুতরাং এই হাদিস সম্পদ অর্জন ও কর্মপ্রচেষ্টার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

২.

মিসকিন হয়ে থাকার দুআর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায় এই দুআগুলো :

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ.

- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও লাঞ্ছনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৬৪]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

- হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফর, দারিদ্র্য ও কবরের আজাব থেকে।[৬৫]

- আনাস রা.-এর মা যখন ছোট্ট আনাস রা.-কে নবিজির খাদেম হিসেবে রেখে গেলেন, তখন নবিজি আনাস রা.-এর জন্য দুআ করলেন,

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ.

- হে আল্লাহ! আপনি এর সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন। আর একে যা দেবেন, তাতে বরকত দিয়ে দিন।[৬৬]

আনাস রা. সকলের শেষে ইনতেকাল করা সাহাবিদের মাঝে একজন। তিনি বৃদ্ধাবস্থায় বলেন, আল্লাহর কসম, আমার অনেক সম্পদ, আমার ছেলে-নাতি-

---

[৬৩] সুনানুত তিরিমিজি : ২৩৫২; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১২৬; হাদিসটি সহিহ

[৬৪] সুনানু আবি দাউদ : ১৫৪৪, হাদিস সহিহ

[৬৫] সুনানু আবি দাউদ : ৫০৯০, শাইখ আলবানির মতে হাদিসটি হাসান

[৬৬] সহিহ বুখারি : ৬৩৩৪; সহিহ মুসলিম : ২৪৮১

নাতনি মিলিয়ে তাদের সংখ্যা ১০০-এর বেশি।

সুতরাং দারিদ্র্য চেয়ে নেওয়ার মতো কিছু না। দারিদ্র্য এলে মুমিন সবর করবে, দারিদ্র্য থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করবে জায়েজ পন্থায়। কিন্তু দুনিয়ার ভোগে ডুবে যাবে না। এটাই ইসলাম চায়, আল্লাহ চান, নবিজি চেয়েছেন। ইসলামের জুহদ (দুনিয়ার অনাসক্তি) আর দারিদ্র্য সমার্থক শব্দ না।

৩.

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর একদিন। মদিনার আকাশ ধুলোয় ভরে গেছে। আম্মাজান আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, কেন হচ্ছে এমন। তাকে বলা হলো, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর ব্যবসায়িক কাফেলা ঢুকছে মদিনায়; মালামালভরতি ৭০০ উট। আম্মাজান আয়েশার মনে পড়ে গেল নবিজির একটি কথা। নবিজি বলেছিলেন, আমাকে জান্নাতে দেখানো হয়েছে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। আম্মাজানের এই কথা আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.-এর কানে যেতেই তিনি ৭০০ উটভরতি মালামাল সব আল্লাহর জন্য সদকা করে দিলেন।[৬৭]

ইমাম ইবনুল জাওযি রহ. তার 'মাওযুআত' গ্রন্থে বলেন,

> ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, হাদিসটি মিথ্যা ও প্রত্যাখ্যাত।... এ ধরনের মিথ্যা ও বাতিল হাদিস সাধারণত মূর্খ সুফিরা পছন্দ করে থাকে। তাদের ধারণা ধনসম্পদ কল্যাণের পথে বাধা। অথচ বাস্তবতা হলো, হাদিসটিই বিশুদ্ধ নয়। এটা হতেই পারে না যে, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবির ধনসম্পদ তার কল্যাণের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে; যেখানে সম্পদ উপার্জন সম্পূর্ণ বৈধ। এটা তখনই নিন্দনীয় হবে যখন : ১. অন্যায়-অবৈধ পথে অর্জিত হবে এবং ২. সম্পদের ওয়াজিব হক (জাকাত-উশর) অনাদায় থাকবে। আর আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. এ উভয় থেকে পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন।
>
> আরেক সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবি তালহা রা. মৃত্যুর সময় ৩০০ উট বোঝাই (৪০ মেট্রিক টন) স্বর্ণ রেখে যান। যুবাইর রা. এবং আরও অনেক সাহাবি প্রচুর ধনসম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করেছেন। যদি তারা জানতেনই সম্পদ জমা-উপার্জন করা নিন্দনীয়, তবে নিশ্চয়ই দান করে দিতেন।

---

[৬৭] মুসনাদু আহমাদ : ২৪৮৪২; মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২৬৪; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৯৮; মুসনাদু বাযযার : ৬৮৯৯; মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১৪৮৯২

বস্তুত, কিচ্ছাকাহিনি কথকরা এসব বাতিল হাদিস খুব পছন্দ করে। তারা মানুষকে দরিদ্র থাকতে উৎসাহিত করে আর সম্পদ অর্জনকে নিন্দার চোখে দেখে। মহান আল্লাহ কতই-না মহান, যিনি আমাদের আলেমদেরকে এমন যোগ্যতা দান করেছেন যে, তারা বিশুদ্ধ হাদিস চিনতে এবং দ্বীনের মূলনীতি বুঝতে সক্ষম।[৬৮]

৪.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি হাদিসে বলেছেন,

"আমার উম্মাহর নিঃস্ব ব্যক্তিরা ধনীদের চেয়ে অর্ধেক দিন আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে দুনিয়ার হিসেবে ৫০০ বছর।"[৬৯]

এই হাদিসটি সহিহ হাদিস। ইমাম তিরমিজি নিজেও সহিহ বলেছে। শাইখ আলবানি রহ.-ও সহিহ বলেছেন। এটাও ইচ্ছা করে দরিদ্র থাকার পক্ষে যায় না। যার সম্পদ আছে, তাকে তো সম্পদের হিসাব দিতেই হবে। আর উম্মাহর নিঃস্ব ব্যক্তি, যেহেতু তাদের হিসাব নেই, তাদের মালসম্পদও কম ছিল, তাই তারা তাড়াতাড়ি যাবেন। নেয়ামত নেই, তাই হিসাবও নেই। তুলনা করা যায় : যে অন্ধ, তাকে চোখের হিসাব দিতে হবে না। সুতরাং চক্ষুষ্মানের চেয়ে তার হিসাব তাড়াতাড়ি হবে।

ওবাইদুল্লাহ মুবারকপুরি রহ. বলেন, নেককার ধনীর মর্যাদার সাথে এটা সাংঘর্ষিক না। এটা কেবলই হিসাব তাড়াতাড়ি হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। (এমন না যে আল্লাহর কাছে মর্যাদা কমে গেছে বলে দেরি হচ্ছে।)[৭০]

৫.

আরেক জায়গায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"সম্পদ ধ্বংস হোক! সোনা-রুপার মালিক ধ্বংস হোক!"[৭১]

আরেক হাদিসে তিনি বলেছেন,

---

[৬৮] আল-মাওযুআত : ১/৩২৭

[৬৯] তিরমিজি : ২৩৫৬, সহিহ

[৭০] মিরআতুল মাফাতিহ

[৭১] সুনানুন নাসায়ি : ৫৩২৬; মুসনাদু আহমাদ : ২৩১০১; হাদিসটি হাসান

"দিনার-দিরহাম তথা সোনা-রুপার মালিক ধ্বংস হোক!"[৭২]

অর্থাৎ, যারা এগুলো জমা করে রাখে, যারা সোনা-রুপার মধ্যে আল্লাহর হুকুম (তথা জাকাত) আদায় করে না, তাদের ব্যাপারে রাসুল এ কথা বলেছেন। সব সম্পদই ধ্বংস হোক, বা যেকোনো সম্পদই খারাপ—এটা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা বলা হয়েছে, ফিতরাতি দুনিয়ালোভের বিপরীতে আমাদের দুনিয়াবিমুখতা বাড়ানোর জন্য। এভাবেই গণ-সাইকোলজিকে ম্যানিপুলেট করতে হয়। যারা সম্পদের মধ্যে আল্লাহর হুকুমগুলো পূর্ণ করে না; জাকাত-ফিতরা দেয় না; কুরবানি-হজ এসব হুকুম পুরা করে না, তারা ধ্বংস হোক। হাদিসের উদ্দেশ্য এটাই।

তবে সর্বদা মনে রাখতে হবে, ইন জেনারেল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, স্বল্পেতুষ্টি, সাদাসিধে জীবনকে উৎসাহ দিয়েছেন। কারণ দুনিয়া কামাতে উৎসাহ দিতে হয় না। যদি এভাবে টেনে ধরা না হতো, তবে আমরা ব্যালেন্স করতে পারতাম না। টাকার স্বাভাবিক একটা বিষ আছে। আপনি যতই চেষ্টা করেন না কেন, একটু না একটু 'তামার বিষ' (টাকার খারাবি) আপনাকে স্পর্শ করবেই করবে। দেখুন, যখন গাড়িকে ড্রাইভ গিয়ারে দেবেন, গাড়ি একা একাই একটু একটু চলতে থাকবে। তেমনই আমরা দুনিয়া অটোমেটিক কামাই। গাড়ি যদি আপনি দ্রুত চালাতে চান, তাহলে এক্সিলারেটরে পা দেওয়া লাগে। আর গাড়িকে যদি ব্রেক করতে চান, তাহলে ব্রেকে পা দেওয়া লাগে। কিন্তু এমনিতে গাড়ি বাইডিফল্ট একা একাই একটু করে চলতে থাকে। ঠিক একইরকমভাবে, টাকা যখন আমি ইনকাম করব, এই টাকার একটা বিষ অটোমেটিকলি একা একাই কাজ করতে থাকবে। এটাকে যদি ট্যাকল দিতে হয়, তাহলে আমাকে অ্যাক্টিভভাবে কিছু কাজ করতে হবে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে। টাকার বিষ লাগার জন্য চেষ্টা করতে হয় না, এটা এমনিতেই লাগে। কিন্তু এটা থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করতে হয়। এইজন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মিসকিন অবস্থার শিক্ষা দিচ্ছেন। দুনিয়াবিমুখতার শিক্ষা দিচ্ছেন। ব্রেক টেনে ধরছেন।

---

[৭২] সহিহুল বুখারি : ২৮৮৬; সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৩৫

দুনিয়া বনাম হায়াতুদ দুনিয়া

দুনিয়া (পৃথিবী) ও হায়াতুদ দুনিয়া (পার্থিব জীবন)-এর ব্যবহার কুরআনে ভিন্নভাবে এসেছে। যত জায়গায় আল্লাহ 'হায়াতুদ দুনিয়া' ব্যবহার করেছেন, নেগেটিভ অর্থে করেছেন :

- আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখেরাতের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না?[৭৩]

- হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ো? তবে কি তোমরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী আখেরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য।[৭৪]

- হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য; অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে; আর বড় প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে।[৭৫]

- মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং খেতখামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর কাছেই হলো উত্তম আশ্রয়স্থল।[৭৬]

- অনন্তর যে সীমালঙ্ঘন করে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়, জাহান্নামই হবে তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।[৭৭]

---

[৭৩] সুরা আনআম : ৩২

[৭৪] সুরা তাওবা : ৩৮

[৭৫] সুরা ফাতির : ৫

[৭৬] সুরা আলে-ইমরান : ১৪

[৭৭] সুরা নাজিয়াত : ৩৭-৪১

- তোমরা জেনে রেখো! পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্বপ্রকাশ, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে প্রাচুর্যলাভের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছু নয়।[৭৮]

- বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও, অথচ আখেরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী। এটি তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে, ইবরাহিম ও মুসার কিতাবে।[৭৯]

- যারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের চেয়ে ভালোবাসে, মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ থেকে এবং আল্লাহর পথ বক্র করতে চায়; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[৮০]

বিপরীতে যেসব স্থানে শুধু দুনিয়া উল্লেখ করেছেন, সেখানে পজিটিভ অর্থে ব্যবহার করেছেন। দেখুন :

- আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন।[৮১]

- যে-কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।[৮২]

- অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দিলেন দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখেরাতের উত্তম সওয়াব। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন।[৮৩]

- মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-কেউ সৎকাজ করবে, অবশ্যই আমি তাকে 'পবিত্র জীবন' দান করব। আর অবশ্যই আমি তাদের তারা

---

[৭৮] সূরা হাদিদ : ২০

[৭৯] সুরা আলা : ১৬-১৯

[৮০] সুরা ইবরাহিম : ০৩

[৮১] সুরা বাকারা : ২০১

[৮২] সুরা নিসা : ১৩৪

[৮৩] সুরা আলে-ইমরান : ১৪৮

> যা করত তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান প্রদান করব।'[৮৪] (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুফাসসিরের মতে, এই আয়াতে 'হায়াতে তাইয়েবা' বলতে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবনকে বোঝানো হয়েছে।)

অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসা যাবে না, প্রাধান্য দেওয়া যাবে না, অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। তবে দুনিয়ার উপকরণ প্রয়োজনীয় ও জরুরি। দুনিয়ার সাথে হাত লাগাতে হবে, অন্তর লাগানো যাবে না। দুনিয়া থাকবে হাতে, মনে নয়। ঠিক যেমনটি বলেছেন ইমাম গাযালি, ইবনুল কাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিজরি) রহ. এবং আলি রা.-ও।

ইমাম সুফিয়ান সাওরি (৯৭-১৬১) রহ. বিখ্যাত ফকিহ ও দুনিয়াবিমুখ আলেম ছিলেন। কিন্তু ধনী ছিলেন। একজন তাকে তিরস্কার করলে তিনি জবাব দিলেন,

> চুপ থাকো। যদি এই সম্পদ আমাদের না থাকত, তবে রাজাবাদশারা আমাদেরকে রুমালের মতো ব্যবহার করত। (তুলনা করুন আজকে)... শক্ত রুটি খাওয়া আর শক্ত পোশাক পরা জুহদ নয়, বরং জুহদ হচ্ছে দুনিয়া তোমার হাতে থাকলেও তোমার মাঝে প্রবেশ করবে না। দুনিয়ার সম্পদ তোমার হাতে আসুক বা না আসুক, তুমি তার জন্য উতলা হবে না। এটাই হচ্ছে জুহদ।[৮৫]

আলি রা.-এর একটা বিখ্যাত কথা আছে এমন : একজন মানুষ ধনী হওয়া সত্ত্বেও জাহেদ অর্থাৎ দুনিয়াবিমুখ হতে পারে। আবার কেউ গরিব কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে দুনিয়া ঢুকে আছে। সে আরও দুনিয়া চায়, আরও দুনিয়া চায়। সে মানুষ হিসেবে গরিব, কিন্তু তার মধ্যে মালের প্রতি মুহাব্বত, টাকার প্রতি মুহাব্বত এই জিনিসগুলো আছে। তাহলে এই গরিব লোকটাই দুনিয়ালোভী। আবার একজন লোকের অনেক টাকাপয়সা আছে, কিন্তু সে আখেরাতমুখী। সে দান-সদকা করছে, দুনিয়ার লোভ-লালসাগুলো তার মধ্যে নেই। তাহলে এই লোকটা দুনিয়াবিমুখ। সুতরাং ধনী হয়েও দুনিয়াবিমুখ হওয়া সম্ভব, গরিব হয়েও দুনিয়ালোভী হওয়া সম্ভব। এটা হচ্ছে আলি রা.-এর কথার মূল উদ্দেশ্য। ধনী হওয়া দুনিয়াবিমুখতার সাথে সাংঘর্ষিক না।

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

---

[৮৪] সুরা নাহল : ৯৭

[৮৫] ইসলাম জামাল, সচ্ছল হও অক্ষম থেকো না, রুহামা পাবলিকেশন।

> অর্থসম্পদ যখন আপনার অন্তরে না থেকে হাতে থাকবে, তখন অগাধ সম্পদও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর সম্পদ যখন আপনার অন্তরে ঠাঁই পাবে, তখন আপনার হাতে একটা পয়সা না থাকলেও, তা আপনার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[৮৬]

ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহর একটা চমৎকার উক্তি আছে। নৌকা পানিতে চলবে, কিন্তু তাতে যেমন পানি ঢুকতে দেওয়া যাবে না, আমরাও চলব দুনিয়ার ওপর দিয়ে, দুনিয়ার টাকাপয়সা-ধনদৌলতের ওপর দিয়ে, কিন্তু দুনিয়া যেন আমাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকতে না পারে। দুনিয়ার লোভ, দুনিয়ার ভালোবাসা যেন অন্তরের মধ্যে না ঢোকে। চলব দুনিয়ার মধ্য দিয়েই; কিন্তু অন্তর থাকবে খালি। অন্তরটা শুধু আল্লাহকে ভালোবাসার জন্য, শুধু আখেরাতের স্মরণের জন্য, শুধু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসার জন্য। কাজেই এর মধ্যে কোনো দুনিয়া থাকবে না। কোনো লালসা থাকবে না, লোভ থাকবে না।

ইসলাম হচ্ছে মধ্যপন্থা

ক্যারিয়ারের সাথে কি দুনিয়াবিমুখতা সাংঘর্ষিক? সারকথা হলো : না, ইসলামে জীবিকা (মুমিনের ক্যারিয়ার) ও দুনিয়াবিমুখতা সাংঘর্ষিক না। বরং এই দুটোর মধ্যে আমাদের একটা ব্যালেন্স তৈরি করতে হবে। ফরজ পরিমাণ আয় 'প্লাস' সঞ্চয় 'প্লাস' দান-সদকার জন্য এক্সট্রা আয়—এই টোটাল আয়টা এবং দুনিয়াবিমুখতা ও সাদাসিধে জীবনের মধ্যে ব্যালেন্স করতে হবে।

আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমরা প্রোডাক্টিভ হব। আমরা ব্যবসায় লাভ করব, চাকরিতে প্রমোশন পাওয়ার চেষ্টা করব। অফিস-প্রধান হওয়ার চেষ্টা করব, বেশি বেতন পাওয়ার চেষ্টা করব। সবই করব। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে ভোগ করব কম। আয় করব বেশি, ভোগ করব কম। দান-সদকা করে সব আখেরাতে পাঠিয়ে দেবো। সাহাবিগণ আয় কম করতেন, তা কিন্তু না। কিন্তু তারা ভোগ না করে শুধু আখেরাতে পাঠিয়ে দিতেন। তারা কিন্তু গরিব ছিলেন না। তবে অর্থ আসার সাথে সাথেই তারা তা আখেরাতে পাঠিয়ে দিতেন। যেন

---

[৮৬] ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালেকিন : ১/৪৬৩

আখেরাতে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, আমি আখেরাতে জমা করে দিলাম। এটার বদলা আমি আখেরাতে গিয়ে পাব।

মূলকথা হচ্ছে, তারা আয় করতেন অনেক; যেকোনো মাধ্যমে হোক, ভাতার মাধ্যমে হোক, বা ব্যবসার মাধ্যমে হোক, আয় থাকত অনেক, কিন্তু তাদের জীবন ছিল সাদাসিধে। জীবন ছিল মধ্যমপন্থার।

খাব্বাব রা. সবচেয়ে গরিব সাহাবিদের একজন ছিলেন। ১৩ কোটি টাকা তার কাছে মৃত্যুর সময় ছিল। তিনি পুরো টাকাটাকে উন্মুক্ত করে একটা ফান্ড তৈরি করে চলে গেলেন। সেই ফান্ড থেকে গরিব মানুষেরা করজে হাসানা নিত। সাহাবি হজরত উসমান রা. মৃত্যুর সময় সব দান করে দিয়েছেন। দেখুন সাহাবায়ে কেরাম কত চালাক ছিলেন, মৃত্যুর সময় সব টাকা আখেরাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা ছিলেন চালাক। আর আমরা হলাম বোকা। আমরা দুনিয়াতে জমিয়ে রেখে যাই। পরে বারো ভূতে লুটে খায়। আর তারা টাকা আসার সাথে সাথে আখেরাতে পাঠিয়ে দিতেন। যেহেতু আসল জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবন।

- নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আবু বকরের সম্পদ আমার যেরকম উপকার করেছে, অন্য কারও সম্পদ সেরকম করেনি।" আবু বকর রা. মক্কার জীবনে ছিলেন কুরাইশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ধনী।

- তাবুকের যুদ্ধে উসমান রা. একাই ৯৪০টি উট[৮৭] ও ৬০টি ঘোড়া সদকা করেন। ধরুন আজকের দিনে ১০০০টা গাড়ি। ৩৫ হাজার দিরহামে রুমা কূপ কিনে ওয়াকফ করেন। ২৫ হাজার দিরহামে জমি কিনে মসজিদে নববি সম্প্রসারণ করেন।[৮৮]

- আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা. ছিলেন সাহাবিদের মাঝে সবচেয়ে ধনী। তার দানের একেকটা লটবহর ছিল : একবারে ১০০০ ঘোড়া দিলেন, একবারে ৩০টি গোলাম মুক্ত করলেন[৮৯], একবারে ৪০ হাজার দিরহামে জমি কিনে আম্মাজানদের হাদিয়া দিয়ে দিলেন।

- তালহা রা.-এর আয় ছিল প্রতিদিন ১০০০ দিরহাম (আড়াই-তিন লক্ষ টাকা)। খেতখামার ও ঘরবাড়ি থেকে আসা আয়ই ছিল ৩ কোটি দিরহাম। যুবাইর রা.-এর মদিনায় ১১টি বাড়ি ছিল, বসরায় ২টি, কুফায় ১টি, মিসরে ১টি। পুরো সম্পদের মূল্য ছিল ৫ কোটি দিরহাম। অথচ নবিজি বলে গেছেন, তালহা ও যুবাইর জান্নাতে আমার প্রতিবেশী।[৯০]

---

[৮৭] ১৪০০ বছর আগে মক্কায় ৮০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে ১১ হাজার টাকা দিয়ে একটি মাঝারি সাইজের উট পাওয়া যেত।

[৮৮] ১ দিরহামে একটা মুরগি পাওয়া যেত। দেড় কেজির ব্রয়লার ২০০ টাকা। আবার ১ দিরহাম সমান ৩ গ্রাম রুপা। মার্চ ২০২৩-এ পুরাতন রুপার দাম ৯০ টাকা/গ্রাম, ক্যারেটভেদে ১২০-১৪৭ টাকা। সেই হিসেবে ১ দিরহাম সমান আজকে ২৫০-৩০০ টাকা ধরুন। তাহলে রুমা কূপ পড়েছে ৮৫ লক্ষ-১ কোটি টাকা। জমির দাম ৬২-৭৫ লাখ টাকা।

[৮৯] সাধারণত তখন দাস-দাসীর মূল্য ছিল প্রায় ৫০০ দিরহাম, অর্থাৎ ৭০ হাজার টাকা।

[৯০] সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৪১

সাহাবি	অর্থনৈতিক অবস্থা (আজকের হিসেবে)	শেষ পরিণতি
উসমান রা.	মোট সম্পদ ৫০০ কোটি টাকা	সব দান
আম্মা যাইনাব রা.	বার্ষিক ভাতা দেড় কোটি টাকা	সাথে সাথে দান
খাব্বাব রা.	১৩ কোটি টাকা	উন্মুক্ত ফান্ড করে যান
আম্মা আয়িশা রা.	বার্ষিক দেড় কোটি টাকা ভাতা একবার ১০ কোটি টাকা এলো মুয়াবিয়া রা. পাঠান ১৫ কোটি টাকা ভাগনে দেন ১৫ কোটি টাকা	২৪ ঘণ্টার মধ্যে সব দান পাওয়ামাত্র দান
তালহা রা.	মৃত্যুকালে রেখে যান: ২০ লক্ষ দিরহাম ৩০০ উট বহন করতে পারে, এই পরিমাণ স্বর্ণ	
আবদুর রহমান ইবনে আওফ রা.	ইনতেকালের সময় ৩১০,৩০,০০,০০০ (৩১০ কোটি ৩০ লক্ষ) দিনার রেখে যান।	৫০ হাজার দিনার দান প্রত্যেক স্ত্রী ৮০ হাজার দিনার বদরী সাহাবী প্রত্যেকে ৪০০ দিনার (১০০ জন জীবিত ছিলেন)

- ১ দিনার = ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ। ১ গ্রাম স্বর্ণের বর্তমান বাজারমূল্য হলো ৭৫০০ টাকা। অর্থাৎ ১ দিনার = ৩১,৮৭৫ টাকা। নবিজি একটা ছাগল কেনার জন্য একজনকে ১ দিনার দিয়েছিলেন। তিনি সেই ১ দিনার দিয়ে দুইটা ছাগল কিনেছিলেন। এখন দুইটা ছাগলের মূল্য ৩০ হাজার টাকাই হবে।

  সেই হিসেবে ইবনে আওফের সম্পদের বর্তমান মূল্য হলো ৯৩ লক্ষ কোটি টাকা। ডলারের হিসাবে এটার মূল্য ৮৮৬ বিলিয়ান ডলার। তুলনীয় : মার্চ ২০২৩-এ ইলন মাস্কের সম্পদ ১৮৬ বিলিয়ন ডলার।

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের আয় ছিল অনেক। যখন বিভিন্ন দিকে ইসলামের বিজয় সূচিত হলো, এরপরে সাহাবিরা প্রত্যেকেই ধনী ছিলেন। তবে তারা পুরো অর্থটাই বা বেশিরভাগ আখিরাতে পাঠিয়ে দিতেন। দুনিয়া তাদের কাছে আসত, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে তা প্রবেশ করতে পারত না।

লাইফস্টাইল হবে বেশি করুণও না, বেশি জাঁকজমকপূর্ণও না। নরমাল, সাদাসিধে। সুতরাং এই দুটোর ওপর ব্যালেন্স করাই হচ্ছে, আপনার ইসলামের ওপর থাকা। আপনি আয় করবেন বেশি, কিন্তু ভোগ করবেন কম। আপনার ভোগের জীবন থাকা যাবে না, আপনার থাকতে হবে দান-সদকার জীবন।

> "তোমরা জেনে রাখো যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হলো বৃষ্টির মতো, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়। তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়কুটায় পরিণত হয়। আর আখেরাতে আছে কঠিন আজাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।"[৯১]

- ধনসম্পদ নিয়ে প্রতিযোগিতা করা যাবে না। যেমন, অমুকে ঢাকায় বাড়ি বানিয়েছে, আর আমি এখানেই পড়ে আছি! আমাকেও তা করতে হবে। অমুকের মেয়ে গাড়িতে চড়ে স্কুলে যায়, আমি এখনো কিছুই কিনতে পারলাম না! দুনিয়ার এই প্রতিযোগিতা আমরা কিছুতেই করব না। দুনিয়া নিয়ে পারস্পরিক গর্ব-অহংকার করব না। যেমন, "আমি অনেক টাকাপয়সা কামিয়েছি, আমি তো অনেক বড় হয়ে গেলাম"—এইরকম ক্যারিয়ার নিয়ে গর্ব-অহংকার আমরা করব না, প্রতিযোগিতা করব না।

- এবং আমরা শোভা-সৌন্দর্য গ্রহণ করব না। বেশি বেশি জাঁকজমক, ডিজাইন, প্রতি মাসে নতুন নতুন কাপড়—বিলাসিতা বলতে যা বোঝায়, এটা আমরা এড়িয়ে চলব।

- অহেতুক ক্রীড়া-কৌতুকের পেছনে আমরা ছুটব না। অপ্রয়োজনে খরচ করব না। বর্তমান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ব্যবস্থা, ক্রেডিট কার্ডের ধারণা,

[৯১] সুরা হাদিদ : ২০

> উইন্ডো শপিং (অহেতুক বাজারে ঘোরাফেরা) এগুলো সবই এমন জিনিস কেনার কাজে আমাদেরকে প্ররোচিত করে।[৯২]

হাদিসে এসেছে যে, পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত আদমসন্তান হাশরের ময়দানে একটা কদমও এগোতে পারবে না। সেই পাঁচটা প্রশ্ন হলো—

এক. জীবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছ?

দুই. যৌবনকে কোন কাজে ব্যয় করেছ?

তিন. কোন পথে আয় করেছ?

চার. কোন পথে ব্যয় করেছ?

পাঁচ. অর্জিত জ্ঞান অনুসারে কতটুকু আমল করেছ?[৯৩]

এর মানে, কোন পথে আয় করেছি এবং কীভাবে আমি টাকাটা ব্যয় করলাম তার হিসেবও আমাকে দিতে হবে। সুতরাং উল্লিখিত কয়টা কাজে আমি দুনিয়াকে ব্যবহার করব না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "দুনিয়ার জীবনটা ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া কিছুই না।" কারণ, দুনিয়া বাইডিফল্টই এমন। কিন্তু দুনিয়া আমাদেরকে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে, জীবিকা উপার্জন করতে বলা হয়েছে, দান-সদকা করতে বলা হয়েছে এবং বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করতেও বলা হয়েছে। যেহেতু এটি আল্লাহ ও তার রাসুলের হুকুম। তাই আমরা এটা করব। রিজিক তো আসে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে, আসল জীবন তো আখেরাতই। কিন্তু আল্লাহ ও রাসুল করতে বলেছেন বলেই করি। এভাবে আমরা নিয়তটাকে ঠিক করব।

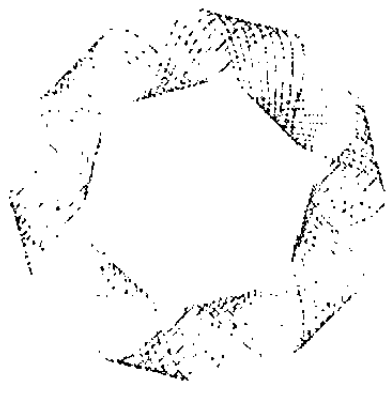

---

[৯২] শরীরচর্চা ছাড়া।

[৯৩] সহিহুল বুখারি : ২৯৭৭; সহিহ মুসলিম : ৫২৩; সুনানুন নাসায়ি : ৪২৮০

পুঁজি বনাম পুঁজিবাদ

এক হাদিসে এসেছে, শয়তান বলে সম্পদশালী ব্যক্তি আমার থেকে বাঁচতে পারবে না। তাকে তিনটির যেকোনো একটির মুখোমুখি হতেই হবে।

১. হয় আমি তার চোখে সম্পদকে সুশোভিত করে দেখাব, ফলে সে অবৈধ পন্থায় তা অর্জন করবে।
২. সম্পদকে তুচ্ছ করে দেখাব, ফলে সে অবৈধ পথে খরচ করবে।
৩. সম্পদকে তাঁর কাছে প্রিয় করে তুলব, ফলে সে ওই সম্পদে আল্লাহর যে অধিকার আছে, তা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকবে।[৯৪]

বোল্ড করা তিনটাই হচ্ছে পুঁজিবাদ—অবৈধ পন্থায় তা অর্জন, অবৈধ পথে খরচ, সম্পদে আল্লাহর যে অধিকার আছে, তা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকা। পুঁজিবাদের মূল কথাই হলো যে, পুঁজিকে বৃদ্ধি করতে হবে। মুনাফা-লাভ-প্রফিটের মাধ্যমে পুঁজিকে বাড়াতে হবে।

প্রত্যেকটা মানুষই পুঁজিবাদী হতে পারে। ফ্যাক্টরির মালিকই যে পুঁজিবাদী, তা নয়। ফ্যাক্টরিতে যে শ্রমিক কাজ করছে, সেও পুঁজিবাদী হতে পারে। সেও যদি চায় যেকোনো মূল্যে তার সঞ্চয় বাড়ুক, তার পুঁজি বাড়ুক, বাছবিচার ছাড়া আরও বেশি ইনকাম সে করতে পারুক। এর মানে মানসিকভাবে সেও পুঁজিবাদী মানসিকতা লালন করছে। মোটকথা হচ্ছে, এখানে 'অবৈধ পন্থায় অর্জন করা'র বিষয়টা আছে। ব্যবসা করা তো আল্লাহ তাআলা হালাল বলেছেন। ব্যবসা করে মুনাফা করা, বৃদ্ধি করা—এটাতে তো সমস্যা নেই।

মানে দাঁড়াল, শুধু পুঁজিতে কোনো সমস্যা নেই। পুঁজি বাড়ছে, এটাও কোনো সমস্যা না। কিন্তু পুঁজিবাদ হচ্ছে এমন একটা মানসিকতা যে, 'যেকোনোভাবেই হোক, যেকোনো মূল্যেই হোক, যেকোনোকিছু বিসর্জন দিয়েই হোক, আমাকে আমার পুঁজি বৃদ্ধি করতেই হবে'। এটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী মানসিকতা। এখানে

[৯৪] তাবারানি, হাদিসটি হাসান

শয়তানের কথার দ্বারা তিনটা জিনিস আমরা বুঝে ফেললাম—

১.

অবৈধ পন্থায় অর্জন করা। অর্থাৎ, টাকা উপার্জনের ক্ষেত্রে, পুঁজি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সে বৈধ-অবৈধের ধার ধারছে না। জায়েজ-নাজায়েজ, হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা নাই। এটা একটা পুঁজিবাদী মানসিকতা।

২.

অবৈধ পথে খরচ করা। মানে, সে ভোগবাদী। সে ইচ্ছেমতো ভোগ করছে, যা ইচ্ছে তা-ই। সে হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা করছে না। এটাও একটা পুঁজিবাদী মানসিকতা, ভোগবাদী মানসিকতা (consumerism)।

পুঁজিবাদও চায় সবাই ভোগবাদী হোক। এজন্য বহু প্রোডাক্ট তৈরি করে তারা। প্রোডাক্ট ও সেবার মাধ্যমে তারা লাভ করতে চায়। মানুষ যত ভোগবাদী হবে, ততই সে পুঁজিবাদের প্রোডাক্টগুলো ব্যবহার করতে থাকবে। এবং পুঁজিবাদ তত লাভ ঘরে ওঠাতে পারবে। এজন্য পুঁজিপতিরা ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীবাদ প্রভৃতি ব্যবহার করে সমাজ ভেঙে দেয়, পরিবার ভেঙে দেয়, অর্গানিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল করে দেয়, পরিবার গঠন পিছিয়ে দেয়, লিভ-টুগেদারভিত্তিক ভঙ্গুর পরিবার (fragile family) তৈরি করে। তাহলে—

ক. যে চাহিদাগুলো সমাজ-পরিবার পূরণ করত, সেই শূন্যতা পূরণের জন্য নিত্যনতুন প্রোডাক্ট-সেবা নিয়ে আসে পুঁজিবাদ (মাইক্রোক্রেডিট, ফাস্টফুড, সারোগেট মাদার সার্ভিস, কাডলিং সার্ভিস, সেক্সটয়, পতিতাবৃত্তি, ডে-কেয়ার ইত্যাদি)।

খ. নারীকে পরিবার থেকে পৃথক করে তার শ্রম স্বল্পমূল্যে এভেইলেবল

করা[৯৫], তাকে যৌনপ্রতীক হিসেবে ব্যবহার[৯৬] এবং স্বতন্ত্র ভোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

গ. পিতাহীন সন্তান হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম ভোক্তা।[৯৭] যা যা এই ভোগকে নিরুৎসাহিত করে, ভোগের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়—ধর্ম, পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ—সবকিছুকে ভেঙে অকার্যকর করে দিতে পারলে লাভই লাভ।

৩.

সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যত হুকুম রয়েছে, জাকাত, হজ, কুরবানি, নফল সদকা, সদকাতুল ফিতরসহ বিভিন্নরকম হুকুম রয়েছে, সেই হুকুমগুলো সে পালন করে না। মানে, সম্পদকে সে কুক্ষিগত করে রাখে, জমা করে রাখে, খরচ করে না।

মোট তিনটা জিনিস অর্জন করার ক্ষেত্রে কোনো বাছবিচার নেই। খরচ করার ক্ষেত্রেও কোনো বাছবিচার নেই। এবং সে জমা করে রেখেছে, আল্লাহর হুকুমগুলোকে সে পুরা করছে না। মানুষকে কোনোকিছু দিচ্ছে না। এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে, পুঁজিবাদ।

ব্যবসার মাধ্যমে পুঁজি বাড়ানো ইসলাম নিষেধ করে না। কিন্তু পুঁজিবাদী মানসিকতা, দুনিয়ার প্রতি লোভ, অর্থের প্রতি লোভ, অর্থ বৃদ্ধি করার জন্য

---

[৯৫] ৬০-এর দশকে ফেমিনিজমের দ্বারা মেয়েদের কর্মস্থলে আনা হয় ব্যাপকভাবে। চাকুরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। মেয়েদের জন্য চাকরি অপশনাল, আর পুরুষের তো 'না হলেই নয়'। ফলে, পুরুষরা আগের চেয়ে কম বেতনেও শ্রম দিতে তৈরি থাকে। ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Hernandez 1993, Zill & Nord 1994)

[৯৬] Hofstra University-এর এক রিসার্চে ১৯৮৫টি ডাটা ফলো-আপ করে দেখা হয় ক্রেতার ক্রয় করার ইচ্ছার ওপর সেক্স সিম্বলের প্রভাব আছে কি না। মদের কিছু বিজ্ঞাপনে তারা যৌন সিম্বল রাখলেন যা দেখলে যৌনমিলনের কথা মনে পড়ে। আর কিছু বিজ্ঞাপন রাখলেন সাদামাটা, সিম্বলিজম ছাড়া। দেখা গেল, ক্রেতারা সবসময় যৌন সিম্বলযুক্ত পণ্যটা কিনছে। (Ruth, 1989)

[৯৭] পরিবারে বাবা সন্তানের মাঝে deterred gratification তৈরি করে—'এখন না বাবা, পরে কিনে দেবো'। বাবা না থাকলে সেই পরিবারের সন্তান হয়ে উঠবে compulsive consumer, মানে হলো সে পণ্য কিনতেই থাকবে, ভোগ বাড়াতেই থাকবে—এই মানসিকতার। নতুন এই অর্থব্যবস্থা তো তা-ই চায়, ক্রেতা বাড়ানো, শ্রমিক বাড়ানো। Aric Rindfleisch et al. (1997). Family Structure, Materialism And Compulsive Consumption, Jounal of Consumer Research, vol. 23, no. 4, pp. 312-325.

আল্লাহ তাআলার হুকুমকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেওয়া, অর্থের বেদিতে আল্লাহর হুকুমকে বলি দিয়ে দেওয়া, রাসুলুল্লাহর সুন্নতের পরোয়া না করা, হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা না করা—ইসলাম কঠোরতার সাথে নিষেধ করে। তাহলে বোঝা গেল, পুঁজি ঠিক আছে, ব্যবসা ঠিক আছে; কিন্তু পুঁজিবাদ বা, পুঁজিবাদী মানসিকতা, এটা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

- সবসময় সে প্রফিটই করতে চায় (Profit-motive), যেকোনোভাবেই হোক, সে প্রফিট করতে চায়। পুঁজিবাদী শুধু চায় যেকোনো মূল্যে তার সম্পদ বৃদ্ধি পাক।

- দ্বিতীয় খারাবি হলো : সে পুঁজি আটকাতে চায় (capital accumulation), জমা করে রাখতে চায়। মানুষকে দিতে চায় না। দেখুন, সারা পৃথিবী যে পুঁজিবাদী সফটওয়্যারে চলে, এই কারণে পৃথিবীর ৫০% সম্পদ ১% মানুষের কাছে। আর বাকি ৫০% সম্পদ ৯৯% মানুষের কাছে।[৯৮] দেখুন, কত বড় বৈষম্য। তাহলে এই যে সম্পদের একটা গ্যাপ, এটা হয়েছে পুঁজিবাদের কারণে। কারণ, তারা কেবল অর্জনই করছে, ঊর্ধ্বমুখী প্রবাহ; টাকা নিচে নামছে না। ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য হলো, "সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মাঝেই আবর্তিত না হয়।"[৯৯] জাকাতের মাধ্যমে নিচের মানুষের কাছে যাবে, সদকার মাধ্যমে যাবে, কুরবানির মাধ্যমে ফায়দা পৌঁছাবে—এগুলো হচ্ছে না। বরং টাকা শুধু ওপরের দিকে উঠছে।

- তিন নম্বর সমস্যা হলো, প্রতিযোগিতার মার্কেট (competitive markets)। মানে যেকোনোভাবেই হোক, আমাকে এই মার্কেট ধরতে হবে। কোথাও দশজন মানুষ আছে, দশজনের আটজনের কাছে আমি আমার প্রোডাক্ট বিক্রি করব। মানে, মার্কেটটা আমি একাই দখল করব। আরেকজনকে করতে দেবো না। আরেকজনকে তার মাল বিক্রি করতে দেবো না। এজন্য যা করার দরকার, করব।

- এরপর আছে, laissez-faire বা free-market. আমার ব্যবসায় সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। মার্কেটের ওপর, ব্যবসার

---

[৯৮] Half of world's wealth now in hands of 1% of population, The Guardian (Oct 2015)

[৯৯] সুরা হাশর : ৭

ওপরে সরকার কোনো নীতিনৈতিকতা আরোপ করতে পারবে না। আমরা ইচ্ছেমতো মুক্ত ব্যবসা করব। কীসের ব্যবসা, কীভাবে ব্যবসা—এগুলোতে সরকার নাক গলাবে না। পর্নো, পতিতা, বডি স্পা, মদ, অশ্লীল ফ্যাশন—এনিথিং।

- এটা মানুষকে শোষণ করে (inherently exploitative)। কারণ, দশটা লোককে আমি খাটালাম, এই দশটা লোককে যদি আমি বেতন কম দিই, তাহলে আমার পকেটে টাকা বেশি থাকবে। অতএব, এদেরকে আমি বেতন কম দেবো। আধুনিক দাসপ্রথার মাধ্যমে এদের কোনো বেতনই আমি দেবো না। ওদের পুরো বেতনটাই আমার পকেটে থাকবে। তার মানে, পুঁজিবাদ শোষণ করে। বিপরীতে ইসলাম বলছে : শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার ন্যায্য মজুরি দিয়ে দাও।

- কিছু মানুষকে ইচ্ছে করে একেবারে গরিব করে রাখে (Alienating) সস্তায় শ্রম পাওয়ার জন্য । তৈরি করে রাখে আধুনিক দাসপ্রথা।

- অবক্ষয়কারী একটা অবস্থা (Unstable, unsustainable, Inefficient), যার কারণে বারবার অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এটা টিকে থাকার মতো না।

- ৫০% সম্পদ ১% মানুষের কাছে, আর বাকি ৫০% সম্পদ আছে ৯৯% মানুষের কাছে। গরিব আরও গরিব হয়, ধনী আরও ধনী হয় (massive economic inequality)।

- মানুষকে পণ্য বানিয়ে ফেলে (commodification)। এই যে পর্নোগ্রাফি নারীকে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। এই মিডিয়াব্যবসা নারীকে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। বিলবোর্ড, বিজ্ঞাপন, সিনেমা-নাটকের দ্বারা নারীর রূপ-সৌন্দর্যকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। এটাকে বিক্রি করে সে টাকা নিচ্ছে, মুনাফা করছে। অন্যান্য ব্যবসাতেও মানুষকে কেবল 'বাজার' মনে করে, 'বাজার' ধরতে হবে।

- পরিবেশকে নষ্ট করে (degradation of environment)। সে তার ব্যবসায়িক লাভের জন্য, উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে আসে। এই টেকনোলজিগুলো থেকে বর্জ্যপদার্থ

দিয়েই যে পরিবেশটাকে নষ্ট করছে; এটার দিকে সে তাকায় না। কারণ, তার লাগবে প্রফিট, তার লাগবে ব্যবসা। অন্যের কী হলো না হলো, নদী নষ্ট হলো নাকি পরিবেশ নষ্ট হলো, এগুলো তার দেখার বিষয় না।

- এবং এটি হচ্ছে anti-democratic, anti-human rights. মানুষের অধিকার দেয় না। যেমন, আমাদের দেশে যারা গার্মেন্টস শ্রমিক, তাদের বেতন মাত্র সাত হাজার টাকা।[১০০] ঢাকার শহরে সাত হাজার টাকায় মাসে কিছুই হয় না। শুধু আইভরি কোস্টে নয় লক্ষ শিশুকে তারা খাটাচ্ছে, বিনা বেতনে।[১০১] সারা পৃথিবীতে এখন চল্লিশ কোটি মানুষ আধুনিক দাস, এরা কোনো বেতন পায় না।[১০২] এদেরকে শুধু নামমাত্র কিছু খাবারদাবার দেয়, আর সারাদিন গরুর মতো খাটায়।

- এবং এরা আরও যেটা করে, imperialist expansion and war. এই যে ইউএস ও ইইউ মিলে আফগানিস্তান দখল করল। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া দখল করে তেল নিয়ে চলে যাচ্ছে, সোনা নিয়ে চলে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করল। এগুলো সব পুঁজিবাদ। এই পুরো জিনিসটাই পুঁজিবাদের প্রভাব।

সুতরাং পুঁজি বা ব্যবসা করতে ইসলামে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু পুঁজিবাদী যে মানসিকতাটা, আল্লাহর হুকুমের তোয়াক্কা না করা। এটাই হচ্ছে প্রবলেম ও ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

ক্যারিয়ার বনাম ক্যারিয়ারিজম

দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে, স্রেফ ক্যারিয়ার সমস্যা না। আপনি আপনার জীবিকা উপার্জন করবেন, এটা কোনো সমস্যা না।

ক্যারিয়ারিজম বলা হয়—

---

[১০০] বাসদ (মার্কসবাদী)-এর সাইটে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখের হিসেবে ৫৩০০ টাকা মাসে।

[১০১] ২০১৬-১৭-তে আইভরি কোস্টের ২৩ লাখ এডাল্ট কোকো ফ্যাক্টরিতে দাসত্ব করে। সে দেশের ১০-১৭ বছরের ৮,৯১,০০০ শিশু স্কুলে না গিয়ে কোকো মাঠে নামমাত্র মূল্যে শ্রম দেয়। [Global slavery index 2018 report]

[১০২] The Global Slavery Index 2018, Walk Free Foundation

- devotion to a successful career, often **at the expense of one's personal life, ethics,** etc. মানে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজের নীতিনৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সে তার পেশাগত জীবনে সফল হতে চায়। সে প্রমোশন পেতে চায়। সে আরও টাকা উপার্জন করতে চায়। ব্যবসায় লাভ করতে চায়। ক্যারিয়ারকে সে ওপরে নিয়ে যেতে চায়। সে নিজের ব্যক্তিগত জীবন, স্ত্রী-সন্তানের হক, মা-বাবার হক, কিছুকেই সে তোয়াক্কা করে না। হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজের তোয়াক্কা করে না। ঠিক হলো না, ভুল হলো, অন্যের কষ্ট হলো কি হলো না, কিছুই তার দেখার দরকার নেই। এই যে ক্যারিয়ার করতে গিয়ে এই নিচে নামা, এই মানসিকতাকে বলা হচ্ছে ক্যারিয়ারিজম।

- an attitude or way of behaving that involves **trying to do whatever you can** to make more money or get promoted at your job. এটা হচ্ছে একটা চিন্তা-চেতনা, একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা মানসিকতা। আর তা হলো, আপনি যা মন চায়, তা-ই করবেন। আরও বেশি টাকা আয় করার জন্য, অথবা প্রমোশনের জন্য। এজন্য কোনোকিছুর তোয়াক্কা আপনি করবেন না। এই মানসিকতাকেই বলা হয়, ক্যারিয়ারিজম।

- এটা ইসলামের সাথে যায় না। ইসলাম ক্যারিয়ার করতে আমাদের নিষেধ করে না, কিন্তু ক্যারিয়ারিজমকে নিষেধ করে। পুঁজি উপার্জনকে নিষেধ করে না। কিন্তু পুঁজিবাদী মানসিকতা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। ইসলামের জীবিকার ধারণাটা কী, তা আমরা এতক্ষণ দেখলাম। এখন দেখব 'ইসলামে সম্মানের ধারণা'।

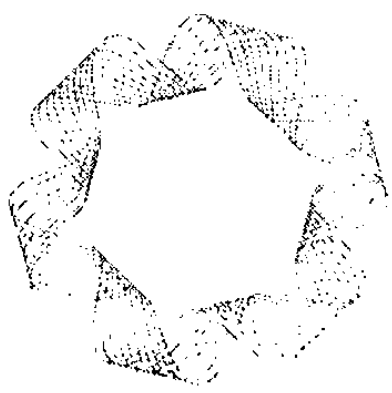

ইসলামে সম্মানের ধারণা

ইসলাম দ্বারা সম্মান আসে

ইজ্জত-সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে আসে। পার্থিব কিছুর সাথে সম্মান জড়িত না। ঠিক যেভাবে রিজিক আল্লাহর কাছ থেকে আসে, সম্মানও আল্লাহর কাছ থেকে আসে। সম্মান শুধু মুমিনদের।

১.

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

> "বস্তুত যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রাসুল ও বিশ্বাসীদের। কিন্তু মুনাফিকরা (কপট) তা জানে না।"[১০৩]

মুনাফিকরা এ কথা জানে না যে, তারা যা করছে তার মধ্যে সম্মান নেই। সেক্যুলার-কাফের-মুরতাদদের সমর্থন, তাদের কাছে প্রিয় হওয়া, স্বীকৃতি লাভ, জাতে ওঠার মাঝে সম্মান নেই। এদেরকে ওরা উচ্ছিষ্টভোগী কুকুর বা ধামাধরা চামচা ছাড়া অন্য নজরে দেখে না। নিজেদের মাঝে আলাপচারিতায় এসব মুনাফিককে নিয়ে ওরা হাসি-তামাশাই করে। বরং বিশ্বাসী যারা, ঈমান এনেছে যারা, ইসলামকে যারা ধারণ করছে, ইসলামের বিজয় চায় যারা, ইসলামের সাথে কোনোকিছুকে আপোশ করে না—তারাই সম্মানের, তাদেরকেই আল্লাহ সম্মান দেবেন। কাফের-মুরতাদরা তাদেরকে ভয় করে চলবে, মাথা নামিয়ে চলবে। নিজেদের মাঝে তাদের বীরত্বের আলোচনা করবে। সুতরাং সম্মান টাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত না, সম্মান জমিজমার সাথে সম্পর্কযুক্ত না। সম্মান রাজনৈতিক বিষয়গুলোর সাথে জড়িত না। বরং সম্মান একমাত্র ঈমানের সাথে জড়িত। যে ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে, সে সম্মান পাবে। সম্মান ইসলামে

---

[১০৩] সুরা মুনাফিকুন : ৮

অটলতার সাথে জড়িত। যে আল্লাহকে রাজি করতে পেরেছে, সে সম্মান পাবে। সম্মান ইসলামে অটলতার সাথে জড়িত।

আল্লাহ তাআলা আমাকে করতে বলেছেন বিধায়, আমরা জীবিকার্জন করি। আল্লাহ করতে না বললে, করতাম না। রাসুলের সুন্নত বলে, তাই আমরা জীবিকার্জন করি। কিন্তু দেবেন কে? একমাত্র আল্লাহ তাআলা। একইভাবে সম্মানও আল্লাহই দেবেন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার দ্বারা, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার দ্বারাই আমি সম্মান পাব। এ ছাড়া অন্য কোনো দিকে যদি আমি সম্মান তালাশ করি, এবং সেখানে যদি আমি আল্লাহকে নারাজ করি, তাহলে সম্মান আমার নাগালে ধরা দেবে না, বরং আমি বেইজ্জত হব।

২.

সুরা আলে-ইমরানের ২৬ নম্বর আয়াতটি দেখুন। আমার প্রিয় একটি আয়াত, যখন আমি ইসলাম বুঝতাম না, তখনও এই আয়াতটি ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়।

> "বলো, হে আল্লাহ! হে রাজত্বের মালিক! আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান, রাজত্ব কেড়ে নেন। আর আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন। আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"[১০৪]

আল্লাহ যাকে চান, তাকে অপমানিত করেন। কারও সবকিছু আছে—বড় ক্যারিয়ার আছে, বড় কোম্পানির সিইও, তার টাকার অভাব নেই, ক্রেডিট কার্ড আছে, কোনো চাহিদা পূরণের অভাব নেই। কিন্তু এরপরও সে বেইজ্জত হবে, যদি আল্লাহ চান। কারণ এগুলোর সাথে মান-অপমান নিশ্চিত নয়, মান-অপমান জড়িত একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে। আল্লাহ যে দ্বীন পাঠিয়েছেন, সেই ইসলামের সাথে, আল্লাহর ওপর ঈমান আনার সাথে। আমি যত ইসলামের ওপর মজবুত, তত আমার সম্মান বাড়তে থাকবে। আর আমি যত ইসলামের ব্যাপারে আপোশকামী, তত আমার লাঞ্ছনা বাড়বে।

তাহলে বোঝা গেল, ক্যারিয়ার দ্বারা আমরা যে দুটি বিষয় চাচ্ছিলাম—

১. রিজিক, এটাও ক্যারিয়ারের সাথে জড়িত না।

---

[১০৪] সুরা আলে-ইমরান : ২৬

২. ইজ্জত বা সম্মান, এটাও ক্যারিয়ারের সাথে জড়িত না।

দুটোই জড়িত আল্লাহ তাআলাকে রাজি-খুশি করার সাথে।

৩.

খলিফা উমর রা.-এর সেনাপতি ছিলেন আবু উবাইদা রা.। তিনি বলছিলেন, "হে খলিফা, আপনি এই তালি দেওয়া জামাটাকে রেখে সুন্দর একটা জামা পরুন। আর যে উটে করে এসেছেন, উটটাকে রেখে একটা ঘোড়ায় চড়ুন। অনারবদের সমাজে এগুলো মানায় না।" উমর রা. সেনাপতি আবু উবাইদার বুকে থাপ্পড় দিয়ে বলেছিলেন,

> "ওহ আবু উবাইদা, যদি তুমি ছাড়া আর কেউ এ কথা বলত, আমি তাকে এমন শাস্তি দিতাম, পুরো উম্মত তা মনে রাখত। আমরা তো লাঞ্ছিত জাতি ছিলাম, আল্লাহ ইসলামের দ্বারা আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। আজ সেই ইসলাম ছেড়ে অন্যকিছুতে সম্মান খুঁজতে গেলে, আল্লাহ আবারও আমাদের লাঞ্ছিত করে দেবেন।"[১০৫]

সম্মান-ইজ্জত, এটা ইসলামের সাথে জড়িত। ইসলামকে যথাযথ পালন করার সাথে জড়িত। আরেকবার উমর রা. বলেন,

> "তোমরা ভাবছ সম্মান এগুলো থেকে আসে? (দুনিয়ার বস্তু দ্বারা) কখনো না। বরং সম্মান আসে ওখান থেকে (আকাশের দিকে ইশারা করে)।"

সুতরাং ক্যারিয়ারের দ্বারাই যে সম্মান পেতে হবে, এ বিষয়টা পশ্চিম আমাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। বিষয়টা সত্য নয়, বরং সম্মান আসে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার মাধ্যমে।

সম্মান আসে জিহাদে

সম্মান আসে জিহাদের দ্বারা, অসম্মান আসে জিহাদ ছেড়ে দেওয়ার দ্বারা।

১.

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, আমি শুনেছি, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[১০৫] মাহজুস সাওয়াব : ২/৫৯০ (সনদ বিশুদ্ধ) সূত্রে আলি সাল্লাবি

> "যখন তোমরা 'ইনাহ' ব্যবসা করবে, এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষবাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।"[১০৬]

এর ব্যাখ্যা হলো, একটি জাতির সকল লোক যদি জিহাদবিমুখ হয়ে চাষাবাদে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন একপর্যায়ে শত্রুদেরকে তাদের ওপর লেলিয়ে দেওয়া হবে। আবু বাকরা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "...এক জাতি হবে যারা গরুর লেজ ধরে চাষাবাদ করবে এবং জিহাদে বিমুখতা প্রকাশ করবে, তারা ধ্বংস হবে।"[১০৭]

আজকে দেখুন, ছাগলের রক্তের যে পরিমাণ দাম আছে, মুসলমানের রক্তের সেই পরিমাণ দামও নেই। একটা মশার রক্তের যে পরিমাণ দাম, মুসলমানের রক্তের সে পরিমাণ দাম নেই। আমাদের ইতিহাসে এতটা লাঞ্ছিত আমরা কখনো ছিলাম না। তাহলে এই অবস্থা হওয়ার কারণ হলো, সম্মানের দরজা আমরা বন্ধ করে রেখেছি, আমরা জিহাদ ছেড়ে দিয়েছি। 'ফরজে আইন' যে আমল[১০৮], তা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর বেইজ্জতি চাপিয়ে দিয়েছেন। ইজ্জত যদি পেতে হয়, এই ফরজে আইনকে আবার জিন্দা করতে হবে।

---

[১০৬] সুনানু আবি দাউদ : ৩৪৬২; মুসনাদু আহমাদ : ৫৫৬২; বাইহাকি : ১০৪৮৪; হাদিসটি সহিহ

[১০৭] সুনানু আবি দাউদ : ৪৩০৬, মিশকাত : ৫৪৩২; হাদিসটি হাসান

[১০৮] যুদ্ধ বা জিহাদ দুই প্রকার : আক্রমণাত্মক এবং রক্ষণাত্মক। আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজে কিফায়া (সামষ্টিক ফরজ) এবং রক্ষণাত্মক জিহাদ ফরজে আইন (ব্যক্তিগত ফরজ)। এই আয়াতের যেকোনো বিস্তারিত তাফসিরেই আপনি পাবেন এই কথাগুলো : মুসলিম ভূখণ্ড এক বিঘত পরিমাণও কাফেরদের অধীনে চলে গেলে ওই অঞ্চলের মুসলিমদের ওপর জিহাদ ফরজে আইন, বাকি মুসলিমদের জন্য ফরজে কিফায়া। তারা শত্রুর বিরুদ্ধে অপারগ হলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য ফরজে আইন, বাকিদের জন্য কিফায়া। **এভাবে ক্রমান্বয়ে পাশের এলাকা, তারা না পারলে তার পাশের এলাকা, এভাবে ফরজে আইনের হুকুম বর্তাবে।** এটা গেল রক্ষণাত্মক জিহাদ। কোনো আলেম বলে দিক বা না দিক, কেউ যাক বা না যাক, প্রত্যেকের ওপর এই হুকুম। (মাআরেফুল কুরআন, সুরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতের তাফসির দ্রষ্টব্য)

আর আক্রমণাত্মক জিহাদ ফরজে কিফায়া। [দুটোই বিস্তারিত দেখুন, আল-হিদায়া, ই. ফা., ২/৪২৯-৪৩০]

২.

দেখুন সুরা তাওবার ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> "বলো, যদি তোমাদের পিতারা, আর তোমাদের সন্তানেরা, আর তোমাদের ভাইয়েরা, আর তোমাদের স্ত্রীরা, আর তোমাদের গোষ্ঠীর লোকেরা, আর ধনসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছ, আর ব্যবসা তোমরা যার মন্দার ভয় করো, আর বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাসো, (এসব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তার পথে জিহাদ করা হতে অধিক প্রিয় হয়; তাহলে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফয়সালা তোমাদের কাছে নিয়ে আসেন। আর আল্লাহ অবাধ্য আচরণকারীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন না।"[১০৯]

অর্থাৎ, ওই আটটা জিনিস যদি তোমাদের কাছে প্রিয়তর হয় তিনটা জিনিসের চেয়ে (আল্লাহর চেয়ে, আল্লাহর রাসুলের চেয়ে এবং জিহাদ করার চেয়ে), তাহলে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর আজাব তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। যে অবাধ্য আচরণ তোমরা করছ, এর দ্বারা সঠিক পথ তোমরা পাবে না। আমরা ওই তিনটা তথা—আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিয়েছি এবং বাকি আটটা বিষয় সম্পর্কে আমরা সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি, সেগুলো আমাদের প্রিয় হয়ে গেছে। যার কারণে আজকে আমরা এই বেইজ্জতির মধ্যে পড়ে গেছি। সুতরাং ইজ্জত হচ্ছে আল্লাহর সাথে। ইজ্জত ইসলামের সাথে। ইজ্জত জিহাদের সাথে।

৩.

উম্মে মুবাশশির রা. থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> "মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে নিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে। এবং শত্রুরাও তাকে সন্ত্রস্ত করে।"[১১০]

শত্রুকে সন্ত্রস্তকারী সম্মানের পাত্র। অথচ আফসোস, শত্রুকে 'সন্ত্রস্তকারী'-কে আমরা নিজেরাই 'সন্ত্রাসী' বলে গালি দিই, ডিজওন করি। নিঃসন্দেহে এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ-রাসুলের কাছে সে সম্মানিত, আর তাকে

---

[১০৯] সুরা তাওবা : ২৪

[১১০] শুআবুল ঈমান, বাইহাকি : ৪২৯১, সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহা : ৩৩৩৩; এর সনদ বিশুদ্ধ

অসম্মানিত করার দ্বারা আমরাই হীন হয়ে পড়ে রয়েছি।

৪.

সাওবান রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

– অনতিদূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজনপাত্রের ওপর একত্র হয়। (এবং চারদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)

– আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রাসুল?

– বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।

– হে আল্লাহর রাসুল, দুর্বলতা কী?

– দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।[১১১]

এই দুটো জিনিসের কারণে সম্মান উঠিয়ে নেবেন আল্লাহ তাআলা। তাহলে দুনিয়াকে যদি আমরা ভালো না বাসি, আখেরাতকে ভালোবাসি এবং মরতে চাই, শহিদ হতে চাই—এই দুটো জিনিস যদি আমরা নিজের মধ্যে আনতে পারি, আল্লাহ আবার আমাদেরকে সম্মান দান করবেন।

সম্মান আসে তাকওয়ায়

আল্লাহ জানাচ্ছেন,

> "নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান।"[১১২]

টাকার সাথে সম্মানের সম্পর্ক নেই, বরং সম্মানের সম্পর্ক হচ্ছে তাকওয়ার সাথে। যত বেশি আমি আল্লাহকে ভয় করব, আল্লাহ আমার সম্মান তত বাড়িয়ে দেবেন। একটা চমৎকার হাদিস আছে, যখন আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বুকে

---

[১১১] সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৯; মুসনাদে আহমাদ : ২২৩৯৭; হাদিসটি সহিহ

[১১২] সুরা হুজুরাত : ১৪

কাউকে ভালোবাসেন, তখন আল্লাহ তাআলা জিবরিলকে বলেন, হে জিবরিল, অমুককে আমি ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। জিবরিল আলাইহিস সালাম তখন সমস্ত ফেরেশতার মধ্যে ঘোষণা করেন, হে ফেরেশতাগণ, অমুককে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, আমি ভালোবাসি, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন সমস্ত ফেরেশতা দুনিয়াতে সবখানে ঘোষণা করে দেন, হে সমস্ত মাখলুক, শোনো, অমুক গ্রামের অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, জিবরিল ভালোবাসেন, আমরা ফেরেশতারাও ভালোবাসি, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন সমস্ত মাখলুক তাকে ভালোবাসে।[১১৩] সবাই তাকে সম্মান করে, ইজ্জত দেয়। সুতরাং ইজ্জত-সম্মান তাকওয়ার সাথে সম্পর্ক।

জাবের বিন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন,

> "হে লোকসকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবির ওপর অনারবির এবং অনারবির ওপর আরবির, কৃষ্ণকায়ের ওপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের ওপর কৃষ্ণকায়ের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল, তাকওয়ার কারণেই।[১১৪]

সুতরাং তাকওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা আমার সম্মান দেবেন।

সম্মান আসে ইলমে-আমলে

আলেমদের যে কত সম্মান, চিন্তা করা যায় না। হজরত যাইনুল আবেদিন রহ. (আলি বিন হুসাইন) হাঁটছিলেন, আর রাস্তায় সকল মানুষ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তখন ওই সময়কার খলিফা সুলাঈমান বিন আবদুল মালিক (সম্ভবত), জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তি কে? মানুষ একে এত সম্মান করছে কেন? আমি খলিফা মক্কায় তওয়াফ করি, আমাকে কেউ সম্মান করে না, আর এই লোককে এত সম্মান করছে! তখন বলা হলো, এই লোক হচ্ছে আলি বিন হুসাইন রা.।

এর মানে, ইলম ও আখলাকের দ্বারা খলিফার চেয়ে বেশি সম্মান হয়ে যায়।

---

[১১৩] সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৭; মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৯৭; হাদিসটি সহিহ

[১১৪] সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৭; মুসনাদু আহমাদ : ২২৩৯৭; হাদিসটি সহিহ

হাসান বসরি রহ.-এর একটা ঘটনা আছে। একবার খলিফা বসে আছেন, খলিফার আশেপাশে অনেক মানুষ। এমন সময় সেখানে হাসান বসরি এসেছেন। সমস্ত মানুষ খলিফাকে ছেড়ে ওখানে চলে গেছে। হাসান বসরির কাছে চলে গেছে। তখন একজন দাসি বলছে, দেখো, এটাই হচ্ছে বাদশাহি। খলিফা যে মর্যাদা পায়নি, হাসান বসরি সেই মর্যাদা পেয়েছে। এটা আসে ইলমের দ্বারা।

সুতরাং সম্মান আসে—

- ইলমের দ্বারা।
- আখলাকের দ্বারা। খেদমতের দ্বারা। মানুষের খেদমত করবেন, আল্লাহ সম্মান বাড়িয়ে দেবেন। আখলাকওয়ালা ব্যক্তি, হতে পারে সে গরিব, কিন্তু তার সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দেন।
- খেদমতের দ্বারা, মানুষের খেদমত করবেন, আল্লাহ সম্মান বাড়িয়ে দেবেন।
- বীরত্বের দ্বারা সম্মান বাড়ে, যে বীর তার সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন।
- নেতৃত্বের দ্বারা সম্মান বাড়ে।
- রাজত্বের দ্বারা সম্মান বাড়ে। যেমন, মুসলিমদের কাছে এখন রাজত্ব নেই, ফলে তারা বেইজ্জত হচ্ছেন।

এই বিষয়গুলো হলো সম্মানের আসবাব। টাকা সম্মানের মাধ্যম কখনোই ছিল না। ইউরোপে যখন পুঁজিবাদের উত্থান ঘটেছে, এই পুঁজিবাদের উত্থানের কারণে টাকার দ্বারা মানুষকে মূল্যায়ন করা শুরু করেছে। অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল ফ্যাসফেল্ড বলেছেন : (১৫শ শতকে নতুন অর্থনীতির বিকাশের পর)

> ...ব্যবহারের নৈতিকতার চেয়ে সম্পদ সংগ্রহের দ্বারা মানুষের বিচার হতে লাগল।...

এর আগ পর্যন্ত উল্লেখিত বিষয়গুলো দ্বারা মানুষদের মূল্যায়ন করা হতো। নারী হোক, পুরুষ হোক। ইলমের কারণে নারী বিখ্যাত হতো, আখলাকের কারণে, খেদমতের কারণে, বীরত্বের কারণে, এগুলোর কারণে নারী-পুরুষ সবাই সম্মানিত হতো। এগুলোই ছিল সম্মান আসার মাধ্যম। কিন্তু

আজকে আমরা টাকার মধ্যে সবকিছু নিয়ে গেছি। কারণ আমরা নিজেরাই ইউরোপিয়ানাইজড। আমরা নিজেরা ইউরোপীয় হয়ে গেছি।

সুতরাং, যে মুমিন না, তার ক্যারিয়ার হলো—টাকা ও সম্মান। আমরা দেখলাম, টাকাও ক্যারিয়ারের সাথে সম্পর্কিত না, সম্মানও ক্যারিয়ারের সাথে সম্পর্কিত না। দুটো জিনিসই আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। ফলে মুমিনের ক্যারিয়ার হবে—দাওয়াহ ও সদকা। আমাদের ক্যারিয়ারের উদ্দেশ্যই হবে এই দুটো। আমার ক্যারিয়ারটা হবে আল্লাহর জন্য; আর টাকা-সম্মান তো আল্লাহ থেকেই আসে।

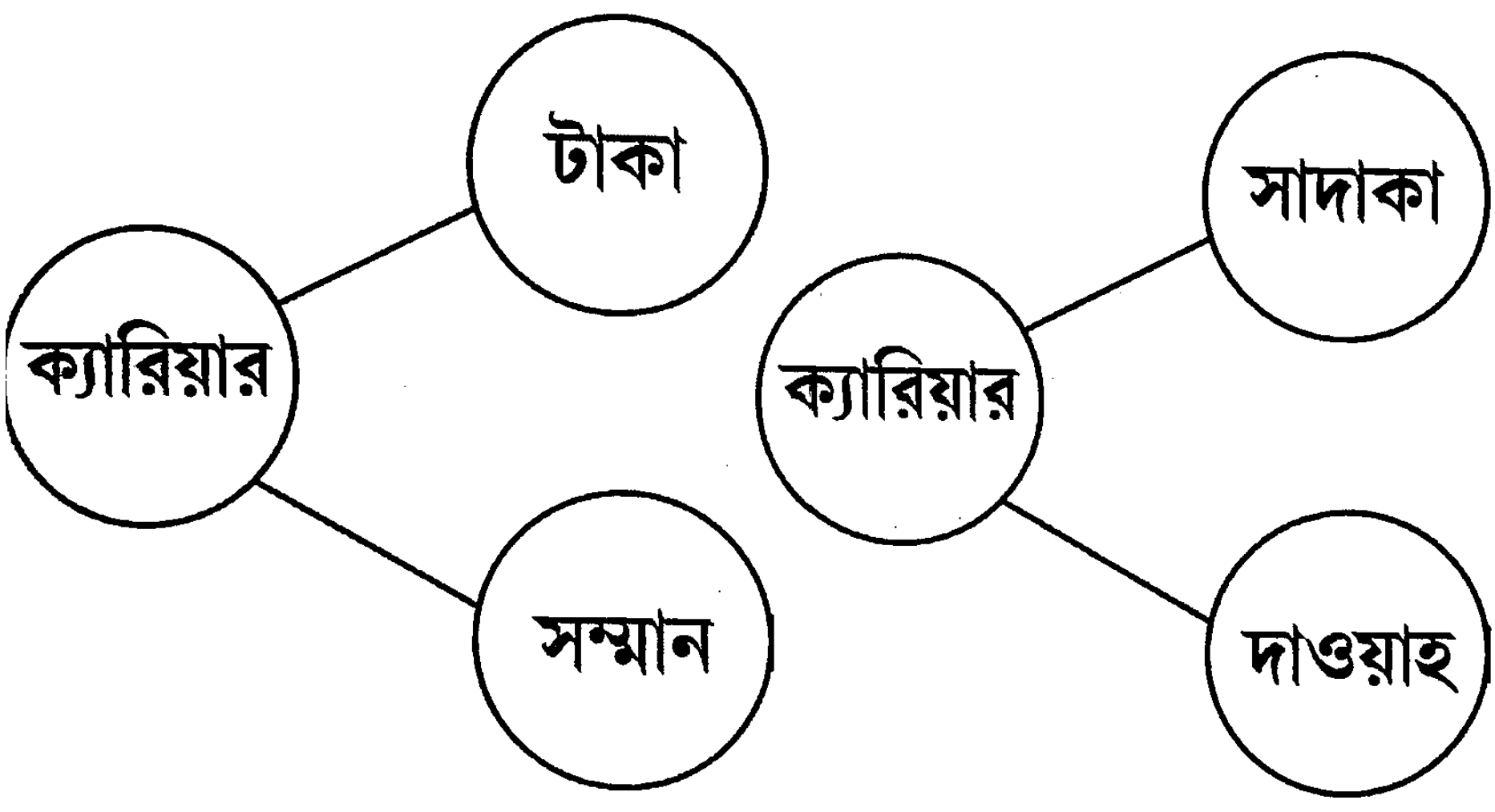

আমার ক্যারিয়ারটাকে ব্যয় করব আমার আসল জীবন, আখেরাতের জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য। আর ওরা তাদের ক্যারিয়ারটা ব্যয় করে দুনিয়ার জীবন পরিপূর্ণ করার জন্য। আমার ক্যারিয়ারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি এই ক্যারিয়ারটাকে ব্যবহার করে দাওয়াহ ও সদকার কাজ করব। যদি এটা করতে পারি, তাহলে এটাই হচ্ছে মুমিনের ক্যারিয়ার। একজন ঈমানওয়ালার ক্যারিয়ার। একজন আখেরাতে বিশ্বাসীর ক্যারিয়ার। একজন আল্লাহওয়ালার ক্যারিয়ার।

ব্যবসা

হালাল রিজিকের মধ্যে সর্বোত্তম রিজিক হলো গনিমত। এরপর হাদিয়া। এরপর[১১৫]...

১. গনিমত
২. হাদিয়া
৩. তেজারত (ব্যবসা)
৪. চাকরি
৫. ভিক্ষা (হালাল কিন্তু নিকৃষ্ট)

হারাম পেশার চেয়ে ভিক্ষা উত্তম। সেটা অন্য আলাপ। **ইসলামে ব্যবসা ইবাদত। ব্যবসার ইসলামি নীতিমালা মেনে ব্যবসা করা আপনাকে সিদ্দিক-শহিদদের সাথে এক কাতারে দাঁড় করাবে।**[১১৬] ব্যবসা ব্যাপারটাই ইসলামের সাথে যায়। ইসলামের মৌলিক মেজাজ ব্যবসার সাথে বরাবর। যেমন :

১.

---

[১১৫] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার রিজিক রাখা আছে আমার বর্শার ছায়াতলে। অর্থাৎ আমার আয়ের উত্তম মাধ্যম হলো গনিমতের সম্পদ। (মুসনাদু আহমাদ : ৫১১৪; সহিহুল জামি : ২৮৩১; হাদিসটি সহিহ)

এ ছাড়াও তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম রিজিক কোনটি? তিনি বললেন, নিজ হাতে কামাই করা অর্থ এবং হালাল ব্যবসার কামাই। (মুসনাদু আহমাদ : ১৭২৬৫; আল-মুসতাদরাক, হাকিম : ২১৫৮: হাদিসটি হাসান)

তা ছাড়া হাদিয়া আদান-প্রদানও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এই ব্যাপারে রাসুল আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি জায়েজ হলেও তাতে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ভিক্ষা করা তিন শ্রেণির মানুষের জন্য প্রযোজ্য : অতি দরিদ্র, ভয়াবহ ঋণে জর্জরিত, দিয়াত আদায়ে অপারগ ব্যক্তি। (সুনানু ইবনি মাজাহ : ২১৯৮)

[১১৬] সুনানুত তিরমিজি : ১২০৯; মিশকাতুল মাসাবিহ : ২৭৯৬; ইমাম তিরমিজির মতে হাদিসটি হাসান, তবে আলবানি রহিমাহুল্লাহর মতে, এর সনদ দুর্বল।

ব্যবসার আয় ফিক্সড না। ফলে তাওয়াক্কুল শেখা যায়, যেটা চাকরিতে সম্ভব না। ফলে রিজিক তালাশে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, আমল, দুআ ইত্যাদির ওপর নির্ভরতা বাড়ে। তকদিরে বিশ্বাস, লেগে থাকার যোগ্যতা, সবর, পজিটিভ থিংকিং, আশা-ভয়ের দোলাচল, ছোট্ট থেকে শুরু করা, পরিশ্রম, কোনো কাজকে ছোট মনে না করা, ঠান্ডা মাথা, তাড়াহুড়াপ্রবণ না হওয়া, বদমেজাজি না হওয়া, আল্লাহর দানশীলতার ওপর অবিচল ভরসা—প্রতিটি জিনিসই ব্যবসার জন্য জরুরি, আর একজন মুসলিম বাই ডিফল্ট এগুলো লালন করে। মুসলিম হিসেবে ওই গুণগুলো আপনার ভেতর এমনিতেই থাকার কথা যেগুলো ব্যবসায় সফল হতে লাগে।

২.

ব্যবসার মধ্যে ইসলাম ঢুকালে সেটা হয় 'খেদমতে খালক'। তার লক্ষ্য থাকে 'কাস্টমার স্যাটিসফেকশন' ও 'এমপ্লয়ি স্যাটিসফেকশন'। ব্যবসা ইটসেলফ একটা নেক আমল হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিমে বড় বড় কোম্পানিগুলো এই নতুন পদ্ধতি এপ্লাই করছে : 'ভ্যালি মানসিকতা'। মানে হলো :

- ক্রেতাকে খুশি করার চেষ্টা।
- কর্মচারীদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা।
- গ্রাহকের সমস্যার সমাধান খোঁজা।
- সবচেয়ে যোগ্য লোক দিয়ে সমস্যার সমাধান করা। সবচেয়ে সেরা উপায়ে।
- পৃথিবীতে অর্থবহ পরিবর্তন আনার চেষ্টা।
- সবকিছু কীভাবে আরও সুন্দর করা যায়।

ইসলাম তো সে কথাই বলে আসছে ১৪০০ বছর ধরে। ইসলাম এই ইহসান ও ইনসাফের কথাই বলে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রেতাকে পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন (পরিমাণের চেয়ে সামান্য বেশি)। আপাতদৃষ্টে মুনাফা কমে যাওয়ার কথা থাকলেও দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত মুনাফা বেড়ে যায়, বরকত হয়। ভালো মানসম্পন্ন পণ্য 'যৌক্তিক লাভ' রেখে ক্রেতাকে পৌঁছে দেওয়া বিরাট বড় নেক আমল। আর পুঁজিবাদ হলো উলটো। ব্যবসা থেকে ইসলামকে বের করে দিলে হয় 'পুঁজিবাদ', জুলুম। কাস্টমার ও এমপ্লয়িকে যতটা সম্ভব কম দিয়ে নিজের লাভ বেশি রাখা।

৩.

ব্যবসা মুসলমানের দাওয়াহ। দক্ষিণ ভারত, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, আমাদের চট্টগ্রাম-নোয়াখালি, আফ্রিকার জাঞ্জিবার, তানজানিয়া, মোজাম্বিকে কোনো মুসলিম আর্মি যায়নি। এখানে গিয়েছে আরব ব্যবসায়ীরা। ব্যবসার মাধ্যমে ইসলাম ছড়িয়েছে এসব এলাকায়। চীনের ক্যান্টন শহরে সাহাবিরা গিয়ে ব্যবসা খুলেছিলেন। স্থানীয়রা ছুটে এসেছে : কারা তোমরা? এ কেমন সুন্দর তোমাদের ব্যবসা?

কেরালা-তামিলনাড়ুর মুসলিমরা সেখানে জনসংখ্যার ৩০-৪০%। জাত ব্যবসায়ী। বড় বড় ব্যবসায়গুলো মুসলিমদের। উত্তরপ্রদেশের মতো মুসলিম নির্যাতন সেখানে নেই। গরু জবাইয়েও সমস্যা নেই। সেখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি, হিন্দুদের চাকরিবাকরি নির্ভরশীল মুসলিমদের ওপর। সুতরাং ব্যবসা মুসলমানের শক্তিও বটে।

৪.

ব্যবসার জন্য আখলাক শেখা জরুরি। ক্রেতাবান্ধব হতে হয়। কাস্টমারের সাথে, কর্মচারীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ব্যবসার জন্য জরুরি।

৫.

লেনদেন সাফ হওয়া, আমানতদারি, মজুরি যথাসময়ে পরিশোধ ইত্যাদি নানান অর্থনৈতিক নেক আমল ব্যবসার সাথে জড়িত।

৬.

আকিদা সহিহ হয়। আল্লাহই যে রাজ্জাক, রিজিক বণ্টনকারী এটা ইয়াকিন হয়। ব্যবসায়ী চোখের সামনে দেখে প্রতিমাসে তার আয় সমান না। আল্লাহ বণ্টন করছেন। চাকরিতে মানুষ মাস শেষে ফিক্সড ইনকাম পায়, কোম্পানি থেকে আসা দেখে। ব্যবসায়ী আল্লাহ থেকে আসা দেখে। লাভ-লোকসানের দোলাচলে সম্পদ যে ক্ষণস্থায়ী, এটা তার মনমগজে বসে যায়।

কলোনিয়াল মানসিকতা ও অভিজ্ঞতা আমাদেরকে চাকরির নিরাপত্তা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। ব্যবসায়কে অনিশ্চিত হিসেবে দেখায়, নেগেটিভ হিসেবে দেখায়।

নেটিভরা ব্যবসা কেন করবে, নেটিভরা করবে চাকরি; আর যত ব্যবসা সব করবে ব্রিটিশ। বিপরীতে দেখুন, ইহুদিরা সন্তানদের শেখায়ই ব্যবসা। **খ্রিষ্টানরা ছাত্রবয়সে পার্টটাইম জব খোঁজে, ইহুদিরা খোঁজে পার্টটাইম ব্যবসা।**

মুসলিম সন্তানদের গণহারে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার। **উদ্যোক্তা-মন তাকে চাকরিতেও ভালো করার যোগ্যতা দেবে। ব্যবসা ব্যাপারটাই একজন মুসলিমের স্বাধীনচেতা মাইন্ডসেটের সাথে যায়, মুসলিম মাইন্ডসেটের সাথে যায়।** চাকরি করতে নিষেধ করছি না। সবাই ব্যবসা করতে পারবেও না। তবে ব্যবসায়ী জ্ঞান, ব্যবসায়ী দৃষ্টি তাকে চাকরিতেও ভালো করার দক্ষতা এনে দেবে। আমরা কেবল চাকরির মুখাপেক্ষী হতে নিষেধ করছি। সুন্দর কয়েকটা বইয়ের নাম বলে দিই :

১. সম্পদ গড়ার কৌশল, সন্দীপন প্রকাশন
২. বিলিয়ন ডলার মুসলিম, সমকালীন প্রকাশনী
৩. প্রোডাক্টিভ মুসলিম, গার্ডিয়ান পাবলিকেশন
৪. শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার ভাবনা, চেতনা প্রকাশন
৫. ইউ মাস্ট ডু বিজনেস, ড. তাওফিক চৌধুরি, সমকালীন প্রকাশন
৬. সচ্ছল হও, অক্ষম থেকো না, ইসলাম জামাল, রুহামা প্রকাশনী

আয় করতে, প্রোডাক্টিভ হতে ইসলাম নিষেধ করে না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনে আস রা.-কে নসিহত করেছেন ব্যবসায় মন দিতে। কারণ হিসেবে বলেছেন : নেক মানুষের হাতে হালাল মাল থাকা উত্তম। কারণ তা দ্বারা সে আত্মীয়ের হক আদায় করবে।[১১৭] ব্যবসা আপনার জন্য আনলিমিটেড আয়ের সুযোগ করে দেয়।

ব্যবসা বলতে আমরা বুঝি, ব্যাংক থেকে পাঁচ লাখ টাকা লোন নিয়ে, ব্যবসা করা। না! বরং ওই ব্যবসাই সফল হয়, যে ব্যবসা ছোট্ট থেকে শুরু হয়। যেমন, শুনেছি, আজাদ প্রোডাক্টের মালিক ঢাকা শহরে এসেছেন, পাঁচটা পোস্টার বিক্রি করতে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে বিরাট ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে। সফল ব্যবসাগুলোর কাহিনিই এরকম। ছোট্ট থেকে শুরু করতে হয়, এবং আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। প্রতিটি সফল ব্যবসা বিরাট আয়োজন করে শহরের প্রাণকেন্দ্রে দোকান নিয়ে বড় পুঁজি দিয়ে শুরু হয় না। বরং **প্রত্যেক সফল**

---

[১১৭] আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৯৯; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৭৬৩; ইমাম মুসলিমের শর্তে হাদিসটি সহিহ

ব্যবসা শুরু হয় ঘরে-গ্যারেজে, ছোট্ট একটা ঘুপচির মধ্যে। সফল ব্যবসায়ীরা বড় দোকান ভাড়া নিয়ে নিজের কাছে ক্রেতা আসার অপেক্ষায় থাকে না, নিজেই ক্রেতার দোরগোড়ায় চলে যাওয়ার ফন্দি খোঁজেন। সফল ব্যবসায়ীয়া প্রচুর ভোগও করেন না, তাদের জীবন থাকে সাদাসিধে। প্রাথমিক বাধ্যবাধকতা ও দায় কমিয়ে ব্যবসা শুরু করুন। প্রতিষ্ঠানের ঘর ভাড়া, কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি হলো প্রাথমিক দায়। শুরুতে নিজেই শ্রম দিন। সম্পদ ব্যয় কম করে পরিশ্রম ব্যয় করুন।

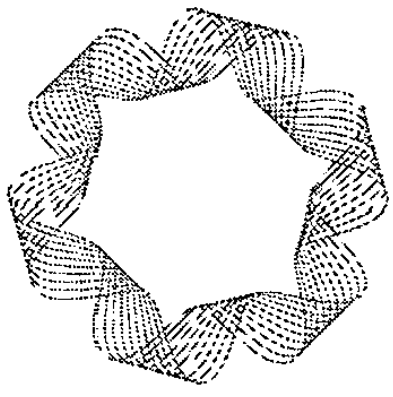

বোনদের ক্যারিয়ার

নারী ও পুরুষের মাঝে যে কোনোরকম পার্থক্য রয়েছে, পশ্চিমা দুনিয়া এটা স্বীকার করে না। 'একটা পুরুষ যা পারে, একটা নারীও ঠিক তা-ই পারে'—নিওলিবারেল দুনিয়ার পবিত্র বাক্য এটা। এই কালেমার বিরোধিতা করা ব্লাসফেমি। সুতরাং 'ক্যারিয়ার' ব্যাপারটাতে নারী-পুরুষে কোনো ব্যত্যয় নেই। নারীরাও এর দ্বারা টাকা ও সম্মানই প্রত্যাশা করে। নিজের আত্মমর্যাদা ও স্বাবলম্বী হওয়া প্রত্যাশা করে থাকে।

আজ যেমন নারী-পুরুষ সবাইকে চাকরি করার দিকে আহ্বান করা হচ্ছে। সবাইকে 'এইম ইন লাইফ' হিসেবে ডাক্তার হব, ইনজিনিয়ার হব, আর্মি অফিসার, পুলিশ ইত্যাদি হব—এগুলো শেখানো হচ্ছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। চিত্রটা চিরকাল এরকম ছিল না। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা, উনিশশ ষাট সালের আগেও ব্যাপারটা এরকম ছিল না। অর্থাৎ, নারী ও পুরুষ উভয়কেই একইভাবে ক্যারিয়ার করতে হবে, নয়টা-পাঁচটা ডিউটি করা, পুরুষ যেরকম সিরিয়াসলি ক্যারিয়ার করছে, টাকা কামাচ্ছে, সম্মানের জন্য ছুটছে; নারীকেও একইভাবে টাকা কামাতে হবে, সম্মানের জন্য ছুটতে হবে। মানে, নারী-পুরুষে আত্মমর্যাদা ও আত্মতৃপ্তির বিষয়টি একইরকম হতে হবে, ভিন্ন নয়—এমনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও ছিল না।

এটি হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। আমেরিকার নেতৃত্বে পুঁজিবাদের উত্থান ঘটল। একদিকে ছিল পুঁজিবাদী আমেরিকান ব্লক, আরেকদিকে ছিল সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ান ব্লক। এই দুই গ্রুপের মাঝে শুরু হলো স্নায়ুযুদ্ধ। কে কত বেশি দেশে নিজ নিজ মতাদর্শ (এর পুঁজিবাদ ওর সমাজতন্ত্র) প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কার অর্থনীতি, বিজ্ঞান, মহাকাশ গবেষণা, আর্মি, উৎপাদন কত উন্নত করতে পারে। কোরিয়া নিয়ে যুদ্ধ, ভিয়েতনাম নিয়ে যুদ্ধ, আফগান নিয়ে যুদ্ধ।

উৎপাদনের এই প্রতিযোগিতার মধ্যে নারীদেরকে গণহারে ক্যারিয়ারের দিকে নিয়ে আসা হলো। বিশ্বযুদ্ধের সময় শ্রমিকেরা গিয়েছিল যুদ্ধে, সেই জায়গাগুলোয় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল নারীদের। বেতন দিতে হতো কম। যুদ্ধশেষে শ্রমিকেরা ফিরে এলো, নারীরা ফিরে গেল ঘরে। এই ঘরে-ফেরা নারীদের জবমার্কেটে ধরে রাখতে পারলে শ্রমের জোগান থাকবে বেড়ে, ফলে শ্রমের দাম যাবে পড়ে।[১১৮] তাই লেখালেখির মাধ্যমে, বেস্টসেলার বইয়ের মাধ্যমে[১১৯], পোস্টারিংয়ের মাধ্যমে[১২০] মেয়েদেরকে বোঝানো হলো :

> ঘরের কাজে তারা অসুখী। বাইরে সে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজের অবস্থান দাঁড় করালেই তারা সুখী হতে পারবে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই; সংক্ষেপে বলি,

---

[১১৮] ১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের বেতন কমে যায়, বেকারত্ব বেড়ে যায়। (Hernandez 1993, Zill & Nord 1994)

[১১৯] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ১৯৪৯ সালে Simone de Beauvoir-এর 'Second Sex' ব্যাপক সাড়া ফেলল। ১৯৬৩ সালে Betty Friedan-এর 'The Feminine Mystique' প্রকাশিত হয়। ৩ বছরে বিক্রি হয় ৩০ লক্ষ কপি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল : সন্তানপালন ও ঘরোয়া কাজকাম নারীকে হতাশ ও অসুখী করে তুলেছে, এটা। বিপুলসংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ নারী হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন, তারা আসলে অসুখী। গড়ে উঠল নারীবাদী আন্দোলন।

[১২০] সে সময়কার তিনটি পোস্টার দেখলেই বুঝবেন, নারীদেরকে কারখানামুখী করার ব্যাপক প্রোপাগান্ডা। একটি বিখ্যাত পোস্টার 'We Can Do It!', ১৯৪৩ সালে বানিয়েছিলেন J. Howard Miller নারীকর্মীদের উৎসাহ ধরে রাখার জন্য। আরেকটা বিখ্যাত ক্যারেক্টার তৈরি করা হয়েছিল, যার নাম Rosie the Riveter, আমেরিকা-ব্রিটেনে অস্ত্র ও সামরিক ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কারখানায় কর্মরত নারীদের গ্লোরিফাই করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল, যাতে নারীরা ব্যাপকভাবে এসবে অংশ নেয়।

সে সময়টাতে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে মোটিভেট করা হয় ক্যারিয়ারের দিকে আসার জন্য।

এখানে ক্যারিয়ার মানে : ফ্যাক্টরিতে চাকরি করা, পুরুষের সাথে জবমার্কেটে আসা, লেবার ফোর্সে আসা। এসে ক্যারিয়ার করা। ব্যাপারটা হচ্ছে, পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্রের সাথে জেতা লাগবে।

জেতার জন্য তখন তাদের বেশি মুনাফা প্রয়োজন, বেশি প্রফিট প্রয়োজন। বেশি প্রফিট যদি পেতে হয়, তাহলে—

এক : ভোক্তা তৈরি করতে হবে। ধরুন, আমার পরিবারে গাড়ি লাগবে একটা, বা ল্যাপটপ লাগবে একটা। এখন আমার ওয়াইফকে এমনভাবে মোটিভেট করে ফেলল, যে এখন আমার পরিবারে ল্যাপটপ লাগছে দুটো। যেখানে একটাতেই পুরো পরিবারের কাজ চলত, সেখানে এখন দুটো লাগছে। অর্থাৎ, ভোক্তা বাড়ানো। ভোক্তা বাড়ালে লাভ হলো, তারা প্রোডাক্ট বেশি বিক্রি করবে, বেশি লাভ নেবে।

দুই : **শ্রমকে সস্তা করে ফেলতে হবে**। যেমন, জবমার্কেটে দশজন পুরুষ আছে, সাথে দশজন নারী চলে এলো। পোস্ট (কর্ম খালি) কিন্তু পাঁচটা। পাঁচটা পোস্টের বিপরীতে দশজন পুরুষ ছিল, এখন দশজন নারী এলো। এখন পাঁচটা পোস্টের প্রার্থী বিশজন। এই বিশজন ক্যান্ডিডেটেরই চাকরি দরকার। আপনি এখন স্যালারি যদি কমিয়েও দেন, অর্ধেকও করে দেন, তারপরও আপনি এই বিশজনের মধ্যে পাঁচজন পেয়ে যাবেনই যাবেন। এভাবে শ্রমকে সস্তা করে ফেলা হলো। **নারীকে জবমার্কেটে আনার মাধ্যমে কৃত্রিম প্রতিযোগিতা তৈরি করে শ্রমকে সস্তা করে ফেলা হয়।**

আর শ্রমকে সস্তা করার মাধ্যমে পুঁজিপতিরা বেশি প্রফিট করে। কারণ বেতন দিতে হয় কম, কম বেতন দিলে তাদের কাছে বেশি লাভ থাকবে। এই ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্বের পরিস্থিতি। এর আগে তাহলে কেমন ছিল দুনিয়া?

ভিক্টোরিয়ান যুগে নারী (১৮৩৭-১৯০১ খ্রি.)[১২১]

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের চেয়ারম্যান Prof. Lynn Abrams জানাচ্ছেন : তখনকার যুগের নারীরা যথেষ্ট **মানসিক পরিপূর্ণতা অনুভব করত গৃহজীবন এবং মাতৃত্বের মাঝেই**। একজন নারীর যে পূর্ণতা, সেটা ঘরোয়া পরিবেশ ও মাতৃত্বে। এটাই ছিল একজন নারীর ক্যারিয়ার এবং এর মধ্যেই সে আত্মমর্যাদা খুঁজে পেত, আত্মতৃপ্তি খুঁজে পেত। এবং স্বাবলম্বন ও ক্ষমতায়ন সবকিছু খুঁজে পেত। এটা তখনকার ইউরোপের নারীদের কথা বলছি।

তখনকার সমাজে পরিবারের গুরুত্ব, বিবাহের স্থায়িত্ব এবং নারীর সহজাত নৈতিকতাবোধ তাদের মধ্যে বজায় ছিল। এবং **এখানে নারীর সম্মান মানে, ফ্যামিলিকে সে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, বিয়েকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার কী চেষ্টা; এবং সতীত্ব, সভ্যতা, ভব্যতা, ভদ্রতা ইত্যাদি দিয়ে একজন নারীর সম্মান নির্ধারণ করা হতো**। অর্থাৎ, নারীর ক্যারিয়ারই ছিল এই বিষয়গুলো। আজ সবকিছু উলটে গেছে। পরিবার গঠনে ব্যর্থ নারী, অসভ্য-বেলেল্লা নারীকে আইকন মনে করা হচ্ছে।

তখনকার **নারীরা ছিলেন ব্যস্ত, সক্ষম এবং সম্মানিতা ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। যাদের মূল শক্তি ছিল তাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার প্রকাশ ছিল অন্যের সেবা**। অথচ আজ ঘরের কাজ যারা করেন, তাদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যে তারা বেকার। শিক্ষিত হয়েও নারী বেকার। কিন্তু ঘরে কি আমাদের মায়েরা বেকার ছিলেন? মোটেই না, তারা নিশ্বাস ফেলার ফুরসত পর্যন্ত পেতেন না আমাদের নিয়ে। ঘরে যে-সমস্ত মহিলারা কাজ করেন, তারা বেকার না।

অর্থাৎ, পুঁজিবাদের যে ভ্যালু সিস্টেম, সেই পুঁজিবাদের জন্য তিনি কাজ করছেন না। ঘরে যে নারী কাজ করেন, তিনি কাজ করছেন তার নিজের জন্য। তার স্বামীর জন্য। তার সন্তানের জন্য। সে পুঁজিবাদের দাসী হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।[১২২] অথচ ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই নারীরা বেকার ছিলেন না। কৃষি-শিল্প সবখানেই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি উৎপাদনে শ্রম দিয়েছেন।

---

[১২১] Lynn Abrams (Glasgow University), Ideals of Womanhood in Victorian Britain. (2012)

[১২২] Nancy Fraser, How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it, Feminism, Capitalism, and the Cunning of History

এখনো দিচ্ছেন। যখন শিল্প ছিল ঘরে (কুটিরশিল্প), তখন তারা ঘরে থেকেই সবকিছু করতে পেরেছেন। আজ যখন শিল্প কেবল বৃহৎ পুঁজির কারখানায় সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে, তখন ঘর ছেড়ে কারখানায় টেনে আনা হয়েছে নারীকে। ঘর ছাড়াকেই ক্যারিয়ার বলা হচ্ছে। ওদিকে শেষ হয়ে গেছে নারীর ঘর, নারীর শরীর, নারীর মন।

ইউরোপের নারীরাও সে সময় বেকার ছিলেন না। তারা ছিলেন কর্মব্যস্ত; তারা সক্ষম; তারা প্রতিষ্ঠিত ফিগার। একদম শক্তসমর্থ ব্যক্তিত্ব। তাদের যে সতীত্ব, ধর্মপরায়ণতা, ধার্মিকতা এবং তাদের যে জনকল্যাণমূলক কাজকর্মগুলো, এসব দ্বারা তাদের সম্মান ও মর্যাদা নির্ধারণ হতো।

আমি শুনেছি, এখনো আমাদের গ্রামের মানুষ এই কথা বলে : আমাদের গ্রামের ৯০% নারী কুরআন শরিফ শিখেছে আমার দাদির মায়ের কাছে। তিনি তো ছিলেন একজন গৃহিণী। কিন্তু পুরো গ্রামে তার কী পরিমাণ সম্মান ছিল, ভেবে দেখুন। ব্যাপারগুলো ছিল এরকম যে, তার সোশ্যাল ওয়ার্ক, মানুষকে সাহায্য করা—এটাই তার সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার উৎস ছিল।

ভিক্টোরিয়ান
নারীদের পোশাক-আশাক

আমার নানি পুরোপুরি পর্দানশিন মানুষ। তিনি পুরো এলাকার মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন, নরমাল ডেলিভারি করানোর জন্য। যত কষ্টই হোক, যত রাতই হোক; নানিকে ডাকা হতো। তিনি হয়তো সারাজীবনে কয়েক হাজারের ওপরে ডেলিভারি করিয়েছেন; ধাত্রী হিসেবে। সম্পূর্ণ ঘরোয়াভাবে শিখে তিনি ফ্রিতে এই সেবাটুকু গ্রামে গ্রামে দিতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত নসিব করুন। আমিন। তার সম্মানের জায়গাটা খেয়াল করুন। মানুষ তার বাসায় উপহারসামগ্রী পাঠাচ্ছে। এই যে মানুষের কল্যাণে কাজ করা এবং তার যে একটা নৈতিক উচ্চতা—এটিই ছিল তার সম্মানের মূল জায়গা।

কিন্তু আজকে মানুষ কোথায় সম্মান খুঁজছে! সতীত্ব হারিয়ে হলেও সিনেমা করবে, নাটক করবে, মডেল হবে, অফিসে সেজেগুজে রূপে সবাইকে মোহিত করে রাখবে। এটার মধ্যে তারা আজ সম্মান খুঁজছে! বিষয়টা তুলনা করুন।

১৮৬১ সালে মিসেস Beeton-এর 'Book of Household Management' (গৃহস্থালি ব্যবস্থাপনা) নামে একটি বই প্রকাশ হয়, যেটা ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বেস্টসেলার হিসেবে ছিল। বইটির বিষয়বস্তু হলো, কীভাবে একজন নিপুণা গৃহিণী হওয়া যায়, কীভাবে কর্মব্যস্ত পুরুষের জন্য জান্নাতি ঘর প্রস্তুত করে রাখা যায়। আপনি সে সময়কার নারীদের রুচিটা খেয়াল করুন। তাদের ক্যারিয়ার, তাদের শিক্ষা, তাদের ফ্যাশন ইত্যাদি বিষয়গুলো কল্পনা করুন। এসব ছিল তাদের নারী-শক্তি, ক্ষমতায়ন। তাদের ক্যারিয়ার।

ফ্যাশন, শিষ্টাচার, ঘরের সাজসজ্জা, সামাজিক কর্মকাণ্ড, ধর্মভক্তি এবং জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম—এসবের দ্বারা তারা নিজেদের এক দুনিয়া তৈরি করে নিয়েছিল, যার মাঝে নারীরা পূর্ণ ক্ষমতায়িত ছিল। অর্থাৎ, সে সময়কার নারীরা ক্ষমতাবতী ছিলেন না, এরকম নয়। বলা যায়, টাকার মাপকাঠিতে ক্ষমতাবতী ছিলেন না। টাকার মাপকাঠিতে মর্যাদাসম্পন্না ছিলেন না। কিন্তু তারা মর্যাদাসম্পন্না ছিলেন, নিজেদের চারিত্রিক গুণাবলি দিয়ে; ইলম দিয়ে। আমরা বহু নারী আলেমার কথা জানি।

মধ্যবিত্ত নারীরা মাতৃত্ব এবং গৃহজীবনকে একটি 'মিষ্টি পেশা' হিসেবে মনে করত। যা ছিল ফ্যাক্টরি-জবের বিকল্প। তখন বিবাহিত নারীর মূলকর্ম ও পেশা ছিল : মাতৃত্ব, সন্তান প্রতিপালন, সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা, পুষ্টি, রুচি,

মনমানসিকতা গড়ে তোলা, সন্তানের ব্রেইন ডেভেলপমেন্ট। এবং ঘরবাড়িটাকে সুন্দর করে ঠিকঠাকমতো গুছিয়ে রাখা; এটাই ছিল তার ক্যারিয়ার, পরিপূর্ণতা ও মর্যাদার স্থান।

একজন নারীর জন্য পরিপক্কতা এবং সম্মান বয়ে আনে বিবাহ। আর মাতৃত্ব দ্বারা নিশ্চিত হতো যে, তিনি প্রকৃত ও পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠতে পেরেছেন। **মাতৃত্বকে দেখা হতো একজন নারীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা হিসেবে, এক সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে, রাষ্ট্রের প্রতি একটি কর্তব্য হিসেবে এবং একটি ফুলটাইম কর্মব্যস্ততা হিসেবে।** সত্যিকারের মাতৃত্ব দাবি করে যে, নারীরা তাদের সন্তানদের জন্য সর্বদা হাজির থাকবে। সে যখন মা হয়ে যাবে, পৃথিবীতে একটি প্রজন্ম উপহার দেবে, এটাই হবে তার নারীজন্মের সার্থকতা। মাতৃত্বই তার পূর্ণতা। **একজন নারীর সমাজসেবাই হচ্ছে, সমাজের জন্য একটি আদর্শ সন্তান রেখে যাওয়া। দেশ ও সমাজের প্রতি তার কর্তব্য হচ্ছে, একজন সুস্থ, সুষ্ঠু মনমানসিকতা ও রুচিসম্পন্ন এক বা একাধিক নাগরিক দুনিয়ায় রেখে যাওয়া। আর এটিই হচ্ছে তার ফুলটাইম জব।**

অর্থাৎ, আজকে আমরা নারীর ক্যারিয়ার বলতে, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে, নারীর স্বাবলম্বী হওয়া ও মর্যাদা-সম্মান বলতে যে জিনিসটা বুঝি; এই ব্যাপারটা চিরকাল এমন ছিল না। ইউরোপের বিভিন্ন দর্শনের সম্মিলনে 'ফেমিনিজম' নামে যে একটা জীবনদর্শন তৈরি হয়েছে, তার মাধ্যমে এটা মূলত পুঁজিবাদের এজেন্ডা, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে।[১২৩] নারীকে জবমার্কেটে নিয়ে আসতে হবে।

---

[১২৩] Nancy Fraser, American critical theorist, feminist, and the Henry A. and Louise Loeb Professor of Political and Social Science and professor of philosophy at The New School in New York City. তিনি বলেন :

"পুরুষ জীবিকা উপার্জন করবে, নারী ঘর সামলাবে—এই পরিবার কাঠামো (male breadwinner-female homemaker family) ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদের কেন্দ্রবিন্দু। নারীবাদের নামে আমরা এই কাঠামোটার সমালোচনা করেছিলাম। এই সমালোচনা এখন কাজে লাগাচ্ছে কর্পোরেট বেসরকারি পুঁজিবাদ (flexible capitalism)। কেননা বেসরকারি পুঁজিবাদ নির্ভরই করে নারীর শ্রমের ওপর, বিশেষ করে সেবা ও শিল্প খাতে নারীর কমমূল্যের শ্রমের ওপর। এই শ্রম কেবল তরুণী অবিবাহিতারা দেয় তা না, বরং বিবাহিতা ও মায়েরাও দিচ্ছে। কেবল কট্টর নারীবাদীরাই দেয় তা না, বরং সব জাতির মেয়েরাই দিয়ে চলেছে। সারা দুনিয়াতেই যেহেতু মেয়েরা শ্রমবাজারে বানের মতো আসছে, আগের সেই পরিবারকাঠামো বদলে হয়েছে, 'দুই রোজগেরে' পরিবার (two-earner family), নারীবাদের কারণে।"

[How feminism became capitalism's handmaiden - and how to reclaim it, Nancy Fraser Feminism, Capitalism, and the Cunning of History]

তাদের বোঝাতে হবে যে, তুমি যদি ক্যারিয়ার করো, তাহলে এটাই তোমার জন্য গৌরব ও সুখ্যাতির বিষয়। মা হওয়া, সন্তান পালন করা, ঘরবাড়ি সামলানো—এটা ছোট কাজ, অসম্মানজনক কাজ। আর চাকরি করা, ব্যবসা করা বিরাট কাজ; সম্মানের কাজ। এ সবকিছু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে, পুঁজিপতি ব্যবসায়ী পুরুষদের নিজস্ব প্রয়োজনে নারীদের মধ্যে ছড়ানো হয়েছে।

ভিক্টোরিয়ান যুগের কথা যা বললাম, এটা ছিল মেয়েদের ক্যারিয়ারের আগের কন্সেপ্ট, যেটি ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ক্যারিয়ারের নতুন যে কন্সেপ্টটা মেয়েদের দেওয়া হয়েছে, সেটি কীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা আমরা এখন দেখব।

নারীর ক্যারিয়ারিজম

নারীর ক্যারিয়ারের যে নতুন সংজ্ঞা, সে মতে বর্তমানে নারীকে পুরুষের সাথে একই ট্রাকে ছোটানো হচ্ছে—ছোট; দৌড়াও। কিন্তু পুরুষ যেভাবে তৈরি, নারী তো সেভাবে তৈরি না। খুব স্বাভাবিক কারণে নারী ও পুরুষ আলাদাভাবে তৈরি। তাদের শরীর, মানসিক সাড়াগুলো আলাদাভাবে তৈরি। তাদের চিন্তাচেতনা, মেমোরি থেকে শুরু করে প্রতিটা জিনিস আলাদাভাবে তৈরি। কারণ তাদের 'রোল' আলাদা। নারীর শরীরই বলে দেয়, তাকে কীসের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পুরুষের শরীরের স্ট্রাকচারই বলে দেয়, তাকে কীসের জন্য তৈরি করা হয়েছে।

নারীর দেহ-মনের ক্ষতি

দেখুন, একজন নারীর প্রতি মাসেই বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। ৯০% নারী মাসিকের আগে PMS নিয়েই দৌড়াচ্ছে (Rapkin & Winer, ২০০৯), পিরিয়ডের ব্যথায় নারী 'কাত করে ফেলা ব্যথা' নিয়েই দৌড়াচ্ছে কিংবা ছুটি নিচ্ছে। এই কঠিন অবস্থা নিয়েই সে অফিসে দৌড়াচ্ছে। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে দৌড়াচ্ছে। নারীকে এটা নিয়ে দৌড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে। যে সময়টাতে তার বিশ্রাম নেওয়ার কথা, তাকে কম স্ট্রেস দেওয়ার কথা, সেই সময়টাতেই পশ্চিমাবিশ্ব ৯০% নারীকে পুরুষের সাথে দৌড়াতে বাধ্য করছে।

কিন্তু পুরুষের তো আর এই সমস্যাটা নেই। একজন পুরুষকে তৈরিই করা হয়েছে এমনভাবে যে, সে স্ট্রেস নিতে পারবে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। তার রেস্টের প্রয়োজন আছে। তাকে কম স্ট্রেস দিতে হবে। স্ট্রেসে থাকা একজন পুরুষের চেয়ে, স্ট্রেসে থাকা একজন নারীর শারীরিক ক্ষতি বেশি হয়। মানসিক অসুখ-বিসুখ বেশি হয়। স্ট্রেসের প্রভাবে লক্ষণগুলো নারীদের বেশি প্রকাশ পায়। একই পরিমাণ স্ট্রেসে পুরুষের তুলনায় নারীদের স্ট্রেস-হরমোন

কর্টিসল বেশি বের হতে থাকে। (Verma, ২০১১)

- ফলে টেনশন-জাতীয় মাথাব্যথা ও মানসিক রোগগুলো নারীদের বেশি হয়; Post-Traumatic Stress Disorder, Panic Disorder বা Obsessive-Compulsive Disorder ইত্যাদি। (Hammen, ২০০৯)

- কমবয়েসী নারীদের হার্টের সমস্যাগুলো মূলত হার্টের ওপর এই স্ট্রেসের কারণেই হয়। (Vaccarino, ২০১৪)

- লম্বা সময় নিয়ে স্ট্রেস থেকে IBS নামক অসুখ হতে পারে। পুরুষের চেয়ে নারীদের এই রোগের হার দ্বিগুণ। (Grundmann, ২০১০)

- স্ট্রেসের কারণে মুটিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নারীদের অনেক বেশি পুরুষের চেয়ে। (Michopoulos, ২০১৬)

- লাগাতার স্ট্রেসে থাকা মহিলাদের PMS-এর সমস্যা বেশি মারাত্মক লেভেলের হয়। (Gollenberg, ২০১০) এগুলো ৯০% নারীর সবার মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায় না, কিন্তু যারা স্ট্রেসে থাকে তাদের মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

নারী স্ট্রেসে থাকার মূল কারণ কী?

নারীর স্ট্রেসের মূল কারণ হচ্ছে, নারী ডাবল রোল প্লে করছে। একসাথে দুটো ভূমিকা রাখছে। সে ঘরে সন্তান রেখে আবার চাকরি করতে চলে যাচ্ছে। যে নারীর একটা ফুলটাইম জব ছিল; সে এখন দুটো ফুলটাইম জব করছে। অফিসে একটা ফুলটাইম জব আবার বাসায় একটা ফুলটাইম জব। এই যে অফিসে ও বাসায় দ্বৈত ভূমিকার কারণেই, তাদের স্ট্রেস পুরুষের তুলনায় বেশি। সুতরাং ক্যারিয়ার ব্যাপারটা একজন নারীর ওপর স্ট্রেস। তার শরীরের জন্য ক্ষতি। তার মনের জন্য ক্ষতি এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ক্ষতি।

অফিসে ও বাসায় নারীর দ্বৈত ভূমিকাই তাদের কর্মস্থলে পুরুষের চেয়ে বেশি স্ট্রেস অনুভব করার মূল কারণ (Prasad, ২০১৬)। নারী-পুরুষ কোনোভাবেই সমান না। চাকরির নামে, স্বাবলম্বী হওয়ার নামে, সমানাধিকারের নামে, ক্ষমতায়নের নামে নারীকে জবমার্কেটে এনে, আমরা এই অতিরিক্ত স্ট্রেসটা নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছি।

- **কর্মজীবী নারীদের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের সম্ভাবনা ৪০% বেশি।** ২০১২ সালে ২২,০০০ নারীর ওপর এক রিসার্চে এসেছে, যেসব নারীর (job-related stress) বেশি, তাদের ৪০% বেশি সম্ভাবনা হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক (cardiovascular event) হবার।[১২৪]

- **ব্রিটেনের মতো স্ট্রেস-ফ্রি দেশেই ৭৯% নারী কর্মক্ষেত্রের স্ট্রেসে ভুগছেন, ৭৮% নারী কর্মজীবীর ঘুমে সমস্যা, মোটের ওপর ৮৭% নারী স্ট্রেসে আছেন বলে জানিয়েছেন।**[১২৫] অথচ, তাদেরকে যদি কর্মক্ষেত্রে না পাঠানো হতো, তারা যদি ঘরে থাকত, সন্তানের সাথে থাকত, মাসিকের সময় রেস্টে থাকত; তাহলে তাদের এই সমস্যাগুলো হতো না। এই অতিরিক্ত স্ট্রেস চাপিয়ে দেওয়ার কারণে, তাদের আজ এই অবস্থা।

- পুরুষের মাঝে কাজ করতে নারী বেশি স্ট্রেস ফিল করে, সেখানেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। **পুরুষপ্রধান কর্মস্থলে কর্মরত নারীরা উচ্চমাত্রার উদ্বেগের মাঝে থাকে।** (high levels of interpersonal stress) যা তাদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে।

- নারী কর্মকর্তারা বেশি স্ট্রেস, উদ্বেগ ও মানসিক সমস্যার সম্মুখীন।[১২৬]

এর মানে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদ এই যে নারীদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, মোটিভেট করে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাল; **এর বিরুদ্ধে নারীর শরীরই বিদ্রোহ করছে। নারীর শরীর তো এটার জন্য তৈরি না। পুরুষের শরীর যার জন্য তৈরি, নারীকে সেই মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।** সুতরাং ক্যারিয়ারের যে কনসেপ্টটা নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে সমানভাবে দেওয়া হলো, তা নারীর শরীরের জন্য, তার মনের জন্য ভালো হয়নি। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কী ক্ষতি হচ্ছে, আমরা তা বিস্তারিত উল্লেখ করব।

মানবপ্রজাতির ক্ষতি

- **গর্ভকালীন স্ট্রেসের দরুন গর্ভকালীন জটিলতা,** যেমন আগেই ব্যথা ওঠা,

---

[১২৪] [Alexandra Sifferlin (August 25, 2015) Women in Male-Dominated Jobs Have More Stress, TIME]

[১২৫] Louise Chunn (Mar 26, 2019) Women Are at Breaking Point Because of Workplace Stress : Wellbeing Survey from Cigna, Forbes.com

[১২৬] Why Women Feel More Stress at Work (Harvard Business Review 2016)

আগে আগেই বাচ্চা হয়ে যাওয়া, কম ওজনের বাচ্চা, প্রি-এক্লাম্পশিয়া, গর্ভকালীন ডায়াবেটিস ইত্যাদি এখন বেশি হচ্ছে। (Coussons-Read, ২০১৩)

- বাচ্চাদের জন্মগত ত্রুটিও বেশি হচ্ছে। যেমন তালুকাটা (cleft palate), গন্নাকাটা (cleft lip), মেরুদণ্ড জোড়া না লাগা (spina bifida), জন্মগত হৃদরোগ (Fallots tetralogy) এবং মাথাবিহীন বাচ্চা (anencephaly) ইত্যাদি। মূলত অতিরিক্ত গর্ভকালীন স্ট্রেসের কারণে। অতিরিক্ত কর্টিসলকে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে। (Carmichael, ২০০৭)[১২৭]

- বাচ্চা হওয়ার পরও বাচ্চার সমস্যা রয়ে যাচ্ছে তার গর্ভকালীন স্ট্রেসের ফল হিসেবে। (Carmichael, ২০০৭) বাচ্চার সম্পর্ক স্থাপনে সমস্যা, খিটখিটে মেজাজ, আবেগিক সমস্যা, অ্যাজমা, অ্যালার্জি, কম রোগ-প্রতিরোধক্ষমতা, বুদ্ধিবিকাশে বাধা, স্মৃতিস্বল্পতা ইত্যাদি। (Coussons-Read, ২০১৩)[১২৮]

- অটিজম রোগাক্রান্ত শিশুও বেশি জন্মাচ্ছে (Varcin, ২০১৭)[১২৯]

- শিফটিং ডিউটি করে যেসব মেয়ে, নর্মালের চেয়ে তাদের মোট ডিম্বাণু ৮.৮% কম। আর পরিণত ডিম্বাণু কমে গেছে ১৪.১%। (Gaskins, ২০১৫)

অর্থাৎ, আমাদের যে-সমস্ত বোন মর্নিং-ইভিনিং-নাইট তথা, শিফটিং ডিউটি করে, এর কারণে তাদের ডিম্বাণু কমে যাচ্ছে। যে কারণে নারীজন্ম, সেটিই শেষ। তাহলে তো পুরুষ হয়ে জন্মানো দরকার ছিল! নারী হয়ে জন্মানোর বিশেষত্বই হলো, পরবর্তী প্রজন্ম রেখে যাওয়া। সেই পরবর্তী প্রজন্মের এই বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। মূলত নারীকে বড়ি খাওয়ানো হয়েছে—সমতার বড়ি, স্বাধীনতার বড়ি, আত্মমর্যাদার বড়ি, ক্ষমতায়নের বড়ি। ক্যারিয়ার কনসেপ্টটা পুরুষ ও নারীর সমান হতে পারে না। নারীর ক্যারিয়ার হবে আলাদা। তাদের শরীর এটাই ডিমান্ড করে। আরও দেখি চলুন।

---

[১২৭] Pregnancy stress causes defects (BBC, 2000)

[১২৮] Stress in pregnancy makes child personality disorder more likely [BBC, 2019]

[১২৯] University of Missouri-Columbia. (2016, June 7). Stress exposure during pregnancy observed in mothers of children with autism: More research needed to understand gene-stress interaction. ScienceDaily.

১৯৮৬, ১৯৮৮ ও ১৯৯০ সালে পরপর তিনটি রিসার্চের ফলাফলের ওপর University of London-এর প্রফেসর Jay Belsky সিদ্ধান্তে আসেন : 'ছোটবয়েস থেকে দীর্ঘসময় বাচ্চাকে মা ছাড়া অন্য কারও কাছে রেখে পাললে (early and extensive nonmaternal care),

- পরবর্তী সময়ে পিতামাতার সাথে সন্তানের দূরত্ব বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সন্তানের ভেতরে রাগ-জেদ ইত্যাদি আগ্রাসী স্বভাব বৃদ্ধি পায়।
- বাচ্চাবয়সে, স্কুলে যাওয়ার আগের বয়সে এবং প্রাথমিক ক্লাসগুলোতে কাঙ্ক্ষিত স্বাভাবিক বিকাশ হয় না (noncompliance)।'
- বাচ্চার ১ম বছরে যেসব মা জবে থাকে ফুলটাইম, সেসব বাচ্চার ৩ বছর, ৪ বছর ও গ্রেড-১-এ বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রোথ তুলনামূলক কম। অর্থাৎ, মায়ের ফুলটাইম জব, বাচ্চাকে আনফিট করে দিচ্ছে।
- এসব মায়ের ডিপ্রেশন হওয়ার হার 'বেকার' মায়েদের চেয়ে বেশি। (Brooks-Gunn, 2010)

এসবের কারণ আছে, বাচ্চার সাথে মায়ের সম্পর্ক তো শুধু মানসিক না, শারীরিকভাবেও বাচ্চার সাথে মায়ের সম্পর্ক থাকে। অক্সিটোসিন নামে একটা হরমোন আছে। বাচ্চা যখন কাঁদে, মায়ের ওই অক্সিটোসিন হরমোনে উথালপাথাল শুরু হয়। ওই হরমোনের কারণে এই মা, না বাচ্চা রেখে অফিসে গিয়ে শান্তিতে আছে, আর না বাড়িতে শান্তিতে আছে অফিসের কথা ভেবে। অফিসে থাকলে বাচ্চা নিয়ে টেনশন, আবার বাসায় এলে অফিস নিয়ে টেনশন। ফলে ডিপ্রেশনের হার ঘরে থাকা মায়েদের চেয়েও বেশি।

এই রিসার্চ কি আমাদের চিন্তার সাথে মিলল? আমাদের যে নারীর ক্যারিয়ার শেখানো হয়েছে। নারীর শিক্ষা, নারীর এ বিষয়গুলো শেখানো হলো, এসবের সাথে তো মিলল না। পুঁজিবাদী-নারীবাদী মতের বিরুদ্ধে হওয়ায় এরপর বেচারাকে ধুয়ে দেওয়া হয়। তারপরও ২০০১ সালে Journal of Child Psychiatry and Psychology-তে তিনি নিজ মতের ওপর অটল থাকেন। (Belsky, ২০০১)

তার মানে বোঝা যাচ্ছে, নারীকে যদি পুরুষের মতো ক্যারিয়ার করতে হয়,

তাহলে নিজের শরীরকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। নিজের মনকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে। নিজের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে স্যাক্রিফাইস করে দিয়ে, এরপর তাকে পুরুষের মতো ক্যারিয়ার করতে হবে। এর আগ পর্যন্ত পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ক্যারিয়ার করার সুযোগ একজন নারীর নেই। যদি না সে নিজেকে শেষ করে ফেলে, যদি না সে তার মনকে শেষ করে ফেলে, যদি না সে তার সন্তানের ভবিষ্যৎকে শেষ করে ফেলে। এই চিন্তা যদি সে না করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে সে 'কথিত ক্যারিয়ার' করতে পারবে না। হাততালি পাওয়া 'ক্যারিয়ার-ওম্যান' হতে পারবে না। শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু আমি ওই কথাই বলব, যে কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কথা সালফে সালেহিন বলেছেন, এবং যে কথা আজকে আধুনিক রিসার্চগুলো পর্যন্ত বলছে : পুঁজিবাদী যে ষড়যন্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার নেতৃত্বে শুরু হয়েছে, এটা মানুষের জীবনবিরোধী। আপনাকে আপনার জীবন উপভোগ করতে দেবে না। আপনাকে নিংড়ে-চুষে কেবল আপনার শ্রমটাকে তারা নিয়ে নেবে। আপনার যে নিজস্ব একটা জীবন, নিজস্ব সুখশান্তি—এটা আপনাকে উপভোগ করতে দেবে না।

এর ফলে কী হয়েছে দেখুন। মানবজাতিই বিলুপ্তির মুখে পড়ে যাবে এই পশ্চিমা সভ্যতার কারণে। সারা দুনিয়া যদি পশ্চিমা সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে লেগে যায়, তবে মানবপ্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার দিকে চলে যাবে।

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মহার ঐতিহাসিকভাবে সর্বনিম্নে পৌঁছেছে, যা গড়ে নারীপ্রতি ১.৭৬ জন সন্তান। ইউরোপীয় ইউনিয়নে গড় জন্মহার ১.৬। ধরুন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি। ১৬ কোটি জনসংখ্যা যদি ১৬ কোটিই থাকতে হয়, তাহলে জন্মহার হতে হবে ২.১। মানে, ২.১ হলে জনসংখ্যা স্থির থাকবে। ১.৭৬ মানে জনসংখ্যা কমতে থাকবে। তো, আমেরিকা-ইউরোপে জনসংখ্যার হার কমছে। এর ফলে কী হবে জানেন? (যেহেতু এখন চিকিৎসাব্যবস্থা ভালো) বুড়ো মানুষের সংখ্যা হবে অনেক। কিন্তু কাজ করার মতো জোয়ান মানুষ হবে কম (এজন্যই ইউরোপ যুদ্ধকবলিত দেশের অভিবাসীদের আশ্রয় দিয়েছে ফ্যাক্টরিগুলো চলমান রাখবে বলে)। শিশু হবে আরও কম।

- এক প্রতিবেদনে ১৯৫টি দেশ নিয়ে গবেষণা করে দেখা গেছে, ২০৫০

সালের মধ্যে, ১৫১টি দেশে জন্মহার ২.১-এর নিচে থাকবে। যদি সমস্ত নারী ১৬ বছরের শিক্ষাজীবন পার করে, এবং ৯৫% নারী জন্মনিরোধ ব্যবহার করে, তাহলে জন্মহার ১.৭-এর চেয়ে কমে যাবে। (হয়ে যাবে ১.৪)

মানে পুরো দুনিয়ার মানুষ কমতে থাকবে। মানুষ কমতে থাকলে তো সমস্যা না, দেশের জন্য ভালো। কিন্তু একটা দেশে যখন বুড়ো মানুষ বেশি, কাজ করার মতো যুবক মানুষ কম, তখন জিডিপি কমতে থাকবে। কর্মক্ষম-বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে জিডিপি বৃদ্ধির হার হ্রাস করবে। গবেষকরা বলছেন, এর আর্থিক পরিণতি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। এভাবে পশ্চিমা দুনিয়ায় মানুষ কমে যাওয়ার মূল কারণ কী?

- যেহেতু এখন মেশিন দিয়ে কাজ চলে, তাই এখন তেমন কর্মী দরকার হয় না। যেমন, কোনো কৃষকের দশটা ছেলে, তাহলে তার কৃষি কাজ করতে সুবিধা হতো, কিন্তু এখন সেটা দরকার হয় না।

- মাইগ্রেশানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিছু মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসছে, কিছু মানুষ বাংলাদেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। এটাও একটা কারণ।

- জন্ম বিরতিকরণ। পরিবার পরিকল্পনা মেথড সবখানে চলে গেছে, যার কারণে পুরো দুনিয়ার জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

- নারীদের উচ্চশিক্ষা। একজন নারী যখন উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে জীবনের ২৮ বছর ব্যয় করে ফেলছে। এর ফলে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। একটা বা দুটো সন্তান জন্ম দিয়েই তাকে থেমে যেতে হচ্ছে। অতএব এতেও মানুষের জনসংখ্যা কমছে, এবং সামনে বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে।

- নারী ক্যারিয়ার করতে গিয়ে দেরি করে বিয়ে করছে। যার ফলে জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

এখন পশ্চিমাবিশ্বে নারীরা যেভাবে ক্যারিয়ার করছে এবং উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, এবং তাদের অনুকরণ করে বাংলাদেশের মেয়েরা বা মুসলিমবিশ্বের মেয়েরাও

যখন ক্যারিয়ার বা উচ্চশিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে, পরিবারকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে। সন্তানপালন, সন্তানের সাথে থাকা এগুলোকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে। ঠিক এভাবেই যদি চলতে থাকে, তাহলে একটা সময় কলকারখানাগুলো শূন্য হয়ে যাবে। একটা দেশের প্রোডাক্টিভিটি শূন্য হয়ে যাবে। সেখানে কাজ করার মতো লোক থাকবে না। কর্মক্ষম-যুবক বয়সের মানুষ থাকবে না; বুড়ো মানুষ অধিক হয়ে যাবে। পুরো বিশ্বের কী অবস্থা হবে!

দেখুন, পশ্চিমাবিশ্বে কীভাবে খুব দ্রুত জনসংখ্যা কমে যাচ্ছে, তাদের ওয়ার্কিং পপুলেশন কমে যাচ্ছে। কারণ হচ্ছে সেখানকার নারীরা অনেক দেরিতে পরিবার গঠন করে, লেবার ফোর্সে কাজ করে, জবমার্কেটে এসেছে গণহারে। পাশাপাশি তারা জীবনের মূল অংশটা, অর্থাৎ যে সময় তাদের জন্মধারণ করাটা সহজ, ওই সময়টাই তারা উচ্চশিক্ষার পেছনে দিয়ে দেয়।

- যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া প্রদেশের কংগ্রেসম্যান Steve King টুইট করেছেন যে, "আমরা অন্য কারও বাচ্চা দিয়ে নিজেদের সভ্যতা পুনরুদ্ধার করতে পারি না।"

- সুইডেনে নারীপ্রতি জন্মহার ১.৮৫ এবং ডেনমার্কে ১.৭৯। কর্মজীবী পিতামাতাকে জন্মদানে আগ্রহী করার জন্য সন্তানগ্রহণ ও পালনে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে যা যা সাপোর্ট দেওয়া দরকার, তার পলিসি নেওয়া হয়েছে। ডেনমার্ক তার নাগরিকদের আহ্বান জানিয়েছে, "Do it for Denmark". কী করবে? ছুটিতে আরও বেশি সেক্স করাটা দেশের জন্য দরকার। দেশের জন্য বেশি বেশি সেক্স করো আর বাচ্চা নাও।

- পোল্যান্ডের সরকার তার নাগরিকদের "খরগোশের মতো বংশবৃদ্ধির" আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও তৈরি করেছে।

- হাঙ্গেরির পরিবার ও যুব প্রতিমন্ত্রী Katalin Novak বলেছেন, "ইউরোপীয় নেতারা এটা নিয়ে খোলাখুলি এবং গুরুত্বের সাথে কথা বলেন না। এবং আমি মনে করি এটি একটি সমস্যা।" নারীপ্রতি জন্মহার ১.৫-এ নেমে যাওয়ায় হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী Viktor Orban প্রস্তাব করেছেন : আরও বেশি হাঙ্গেরীয় শিশু জন্ম দিন। প্রণোদনার একটি প্যাকেজ অফার করেছেন :

- গর্ভধারণে সমস্যা থাকলে দম্পতিদের জন্য পাঁচটি বিনামূল্যে আইভিএফ[১৩০]-এর ব্যবস্থা করা;
- পিতামাতার তিন বছরের মাতৃত্ব-পিতৃত্বকালীন ছুটি;
- শিশুপ্রতি হাউজিং ভর্তুকি দেওয়া (১০ হাজার ইউরো পর্যন্ত) এবং
- ভর্তুকিযুক্ত চাইল্ডকেয়ারের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

২০৩০ সালের মধ্যে জন্মহার ২.১-এ ওঠানো পর্যন্ত এই অফার চলমান থাকবে। অলরেডি Katalin Novak (হাঙ্গেরির পরিবার ও যুব প্রতিমন্ত্রী) জানিয়েছেন : তাদের এই নীতির ফলে ২০১১ সালে যেখানে জন্মহার ছিল ১.৩, সেখান থেকে বেড়ে আজ ১.৫ হয়েছে।

- রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ঘোষণা দিয়েছে, যেসব রুশ নারী ১০টার বেশি সন্তান জন্ম দেবে, তাদেরকে 'মাদার হিরোইন' (জননী দেশনায়িকা) উপাধিতে ভূষিত করা হবে।

মানে, পুরো ইউরোপ এখন বেশি বেশি বাচ্চা নিতে উৎসাহ দিচ্ছে। পশ্চিমাবিশ্বই বিপদ বুঝে তাদের অবস্থান থেকে ফেরত আসছে। আর আমাদের দেশের মেয়েরা সেই আগের মডেলেই পড়ে আছে। পশ্চিমাবিশ্ব থেকে ঠেকেছে; ঠেকে শিখে তারা এখন ফিরে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের নারীবাদীরা এখনো সেই উপনিবেশী প্রভুদের দাসীবান্দিগিরি করে খাচ্ছে।

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদ মেয়েদেরকে গণহারে ক্যারিয়ারের দিকে আনা, বা মেয়েদের 'আগের ক্যারিয়ার' থেকে সরিয়ে এনে গণহারে পুরুষের সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় লাগিয়ে দেওয়া—এর ফলে সারা বিশ্বের অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। মানববিরোধী একটা কাজ। দুনিয়াতে মানুষের জন্মই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মানবপ্রজাতিই বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। এর মানে, পশ্চিমা সভ্যতা ব্যর্থ। এর দ্বারা সুখ তো নেই-ই, বরং এর দ্বারা নারীর নিজের সুখ, নিজের শরীর, মন, সন্তান সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পুরো মানবসভ্যতাই টেনশনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এটার কারণে। আমরা যদি নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারব, নারী ও পুরুষকে একই মনে করা; নারী ও

[১৩০] IVF (In Vitro Fertilization). কাচের টেস্টটিউবের মধ্যে ভ্রূণ নিষেক ঘটানো, তারপর ওই নিষিক্ত ভ্রূণকে মায়ের শরীরে প্রবেশ করানো।

পুরুষকে সমান মনে করা; কাজের ভূমিকা ও তাদের ক্যারিয়ারকে একই মনে করা—এটা একটা বিরাট সমস্যার জন্ম দিচ্ছে।

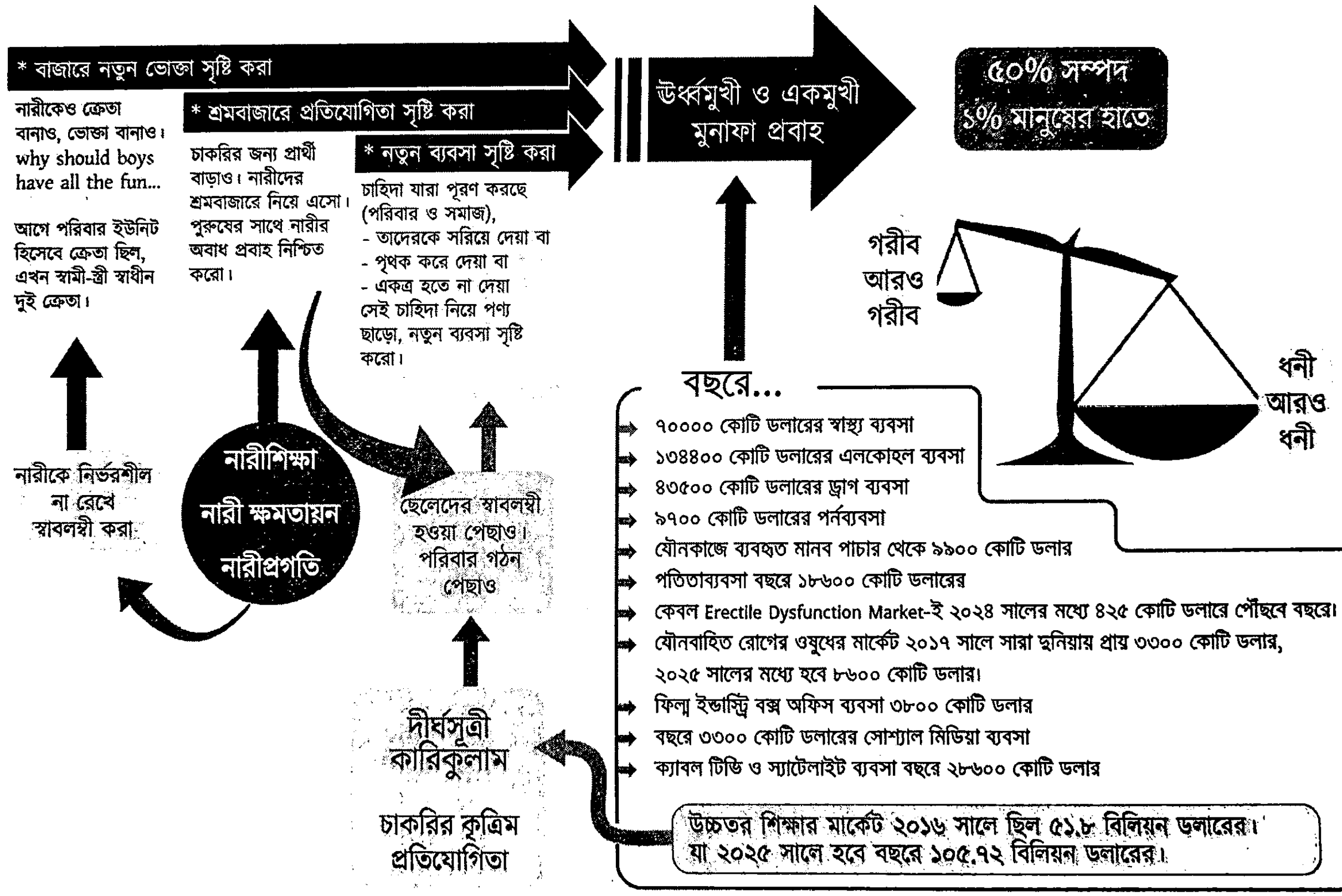

এই চিত্রটির মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি, একই ক্যারিয়ারে দুজনকে আনার ফলে কী হচ্ছে। বাজারে নতুন ভোক্তা তৈরি হচ্ছে, তার ফলে

বিক্রি বাড়ছে, মুনাফা বাড়ছে। নারী শ্রমবাজারে আসার কারণে, শ্রমবাজারে একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। যার ফলে কম বেতনে সবাই চাকরি করতে তৈরি আছে।

তারপর ছেলেদের জন্য একটা অহেতুক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পরিবারগঠনকে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘসূত্রী কারিকুলাম, চাকরির কৃত্রিম প্রতিযোগিতা—এগুলোর মাধ্যমে পরিবারগঠন পিছিয়ে যাওয়ার কারণে, পরিবার যে চাহিদাগুলো পূরণ করত, সে চাহিদাগুলো পূরণ করার জন্য বিভিন্ন সার্ভিসের প্রয়োজন হচ্ছে। খাবারের জন্য ফাস্টফুডের ব্যবসা শুরু হচ্ছে, অবসর সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে।

এগুলো সব হচ্ছে, পরিবার না থাকার কারণে। মানে, পরিবার থেকে মানুষ যে জিনিসগুলো পেত, সে জিনিসগুলো না থাকার কারণে, এগুলো নিয়ে তারা ব্যবসা করতে পারছে। এই পুরো বিজনেস ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে আছে, পরিবারগঠনকে পিছিয়ে দেওয়া, নারীদেরকে শ্রমবাজারে নিয়ে আসার ওপরে।

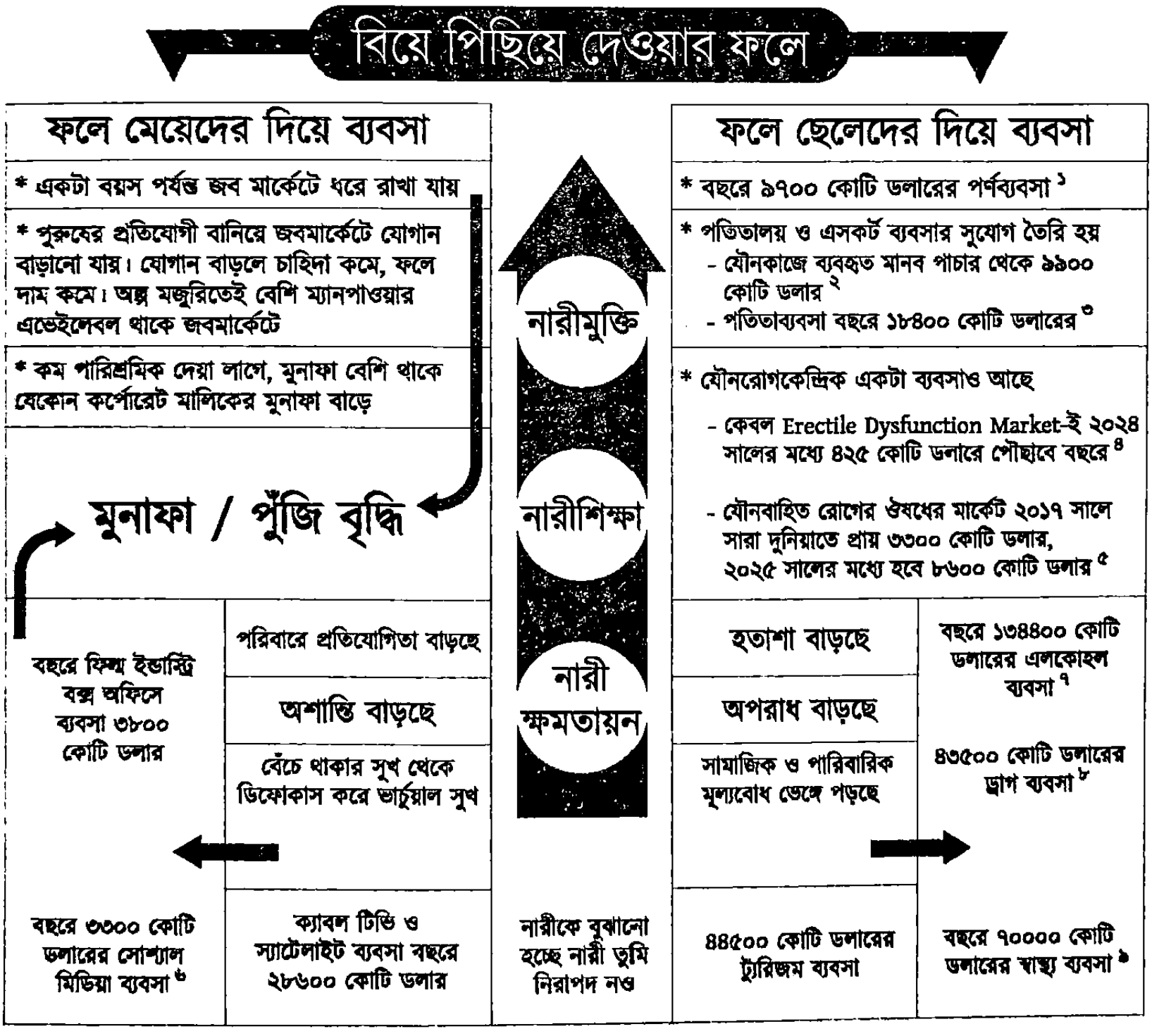

যত ব্যবসা হবে, গরিব আরও গরিব হবে। ধনী আরও ধনী হবে। এই বিষয়টাই আমি এই চিত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

আমাদেরকে ছোটবেলা থেকে যে বিষয়গুলো দেখানো হচ্ছে :

- নারীশিক্ষা মানে শিক্ষিত হয়ে চাকরিতে আসা।
- নারী অধিকার মানে, ঘরের বাইরে চাকরি করার অধিকার।
- নারীর ক্ষমতায়ন মানে, চাকরি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়া।
- নারীস্বাধীনতা মানে, পরিবারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে চাকরি করার স্বাধীনতা।
- নারী, তোমার স্বামী তোমার ওপর জলুম করে, ডিভোর্স দিয়ে চাকরি করো, সমাধান।
- তোমার ওপর ম্যারিটাল রেপ হয়, চাকরি করো।
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তোমার ভালো চায় না, চাকরি করো।

এটা এখনকার আওয়াজ না। এটা সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন পুরুষেরা ফ্যাক্টরি ছেড়ে ছেড়ে যুদ্ধে চলে গেল। আর ওই ফ্যাক্টরিগুলো খালি হয়ে গেল। সেই খালি জায়গাগুলোতে কে কাজ করবে? তাই সেখানে নারীদের আনা হয়েছে। বলা হয়েছে : চাকরি করো, চাকরি করো। পোস্টারের মাধ্যমে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে, বিভিন্ন অফারের মাধ্যমে চাকরির দিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পেছনে আলোচনা হয়েছে। মোটকথা হলো, নারী তুমি চাকরি করো। চাকরি করলে, ভোক্তা তৈরি হবে, শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা তৈরি হবে, নতুন নতুন ব্যবসা সৃষ্টি হবে। এবং পরিবারগঠন পিছিয়ে যাবে, নতুন নতুন ব্যবসা ও সার্ভিস তৈরি করতে হবে; যা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি।

হিসেবের ফাঁদ

অথচ, নারী কিন্তু ক্যারিয়ার অলরেডি করছে। গবেষণায় এসেছে, non-SNA [System of National Account] কাজে (ঘরের কাজে) নারীদের কাজের চাপ ও সময় পুরুষের চেয়ে তিন গুণ বেশি। "Women's Unaccounted Work and

Contribution to the Economy" নামের স্টাডিতে পাওয়া গেছে, যদি নারীর এই ঘরের কাজকে টাকায় পরিণত করা হয়, তাহলে তা দাঁড়াবে জিডিপির ৭৬.৮% থেকে ৮৭.২%। বেতনভুক্ত আয়ের চেয়ে তা ২.৫ থেকে ২.৯ গুণ বেশি।[১৩১]

অর্থাৎ, সারাবছরে বাংলাদেশ টোটাল যে উৎপাদন করে, (উৎপাদন বলতে শুধু চাল-গম এগুলো নয়। বরং উৎপাদন বলতে অনেককিছুই বোঝায়। যেমন, আমার বাসায় একজন ইলেকট্রিশিয়ান এসে ১,০০০/- টাকার বিনিময়ে কিছু সার্ভিসিং করে দিয়ে গেল। ধরুন, আমার এসি পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। এই এক হাজার টাকাটাও জিডিপির মধ্যে যোগ হবে। কিন্তু আমি নিজে যদি আমার এসি পরিষ্কার করি, তাহলে কিন্তু জিডিপিতে কোনো টাকা যোগ হচ্ছে না। এর মানে একজন নারী, অর্থাৎ, আমার স্ত্রী যখন ঘরে রান্না করে, তখন সেটা জিডিপিতে যোগ হবে না। কিন্তু আমার স্ত্রী যদি কোনো বাসায় গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসে, এবং তার বদলে সে যদি কিছু টাকা বেতন পায়, ওই টাকাটা কিন্তু এই জিডিপিতে যোগ হচ্ছে। এই হচ্ছে জিডিপির ফাঁকি।

তার মানে, নারীর ঘরের কাজকে তারা জিডিপির মধ্যে ধরে না। এবং জিডিপির মধ্যে আসে না বলে, তারা নারীকে বেকার বলে। আমার মা-স্ত্রী-বোনদের ক্যারিয়ারকে বলে—বেকার। অথচ, এই কাজটাকে যদি টাকায় পরিণত করা হয়, তাহলে সেটা বাংলাদেশের টোটাল যে আয়, সেই আয়ের ৮০-৯০% হবে।

অনেক বোন বলেন, 'আমরা কী ক্যারিয়ার করব?' আমি তাদের বলব, বোন, আপনারা তো অলরেডি ক্যারিয়ার করছেনই। আপনি যদি একজন স্ত্রী হয়ে, একজন মা বা মেয়ে হিসেবে আপনি যদি ঘরে কাজ করেন, ঘরটা ম্যানেজ করেন, বা পরবর্তী প্রজন্মের ম্যানেজ করেন, তাহলে তো আপনি ক্যারিয়ার করছেনই। আপনার ক্যারিয়ার একটা আছেই। একে যারা গোনায় ধরছে না, সেটা তাদের সিস্টেমের সমস্যা। বেতনভুক্ত আয়, অর্থাৎ আমি নিজে যে আয় করি, তার চেয়ে আমার স্ত্রীর শ্রম-কাজ-ক্যারিয়ার তিনগুণ বেশি। আমার স্ত্রী ঘরে যে কাজ করে, সেটা লোক রেখে করাতে হলে যে খরচ হতো তা আমার বেতনের তিন গুণ।

---

[১৩১] Include unpaid work of women in GDP (The Daily Star, 2019)

সমস্যা কোথায়? **সমস্যা হলো, আমরা পুরুষেরাও নির্বোধের মতো মেয়েদেরকে টাকা দিয়েই মাপি।** পশ্চিমাবিশ্ব যেভাবে টাকা দিয়ে মাপে, আমরাও সেভাবে আমাদের ঘরের মেয়েদের টাকা দিয়ে মাপি। আমাদের প্রবলেম হয়ে গেছে এখানে, আমরাও টাকার জন্য খোঁটা দিই। বলি, ইনকাম করতে কত কষ্ট তা তো বোঝো না, সারাদিন ঘরে বসে থাকো, কাজ তো করো না। মানে, আমাদের পুরুষদের প্রবলেম। নারীরা ক্যারিয়ার করছে না যে, তা কিন্তু নয়। আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি না। পুঁজিবাদী পশ্চিমাবিশ্ব স্বীকৃতি দিচ্ছে না।

আসলে দোষটা কাকে দেবো? দোষ হচ্ছে সিস্টেমের। আজকে কেন ইসলামধর্মের শিক্ষা গুরুত্ব সহকারে আমাকে শেখানো হয়নি। আজকে যদি আমাকে ইসলামের হুকুম-আহকাম, স্ত্রীর কী কী হক, স্ত্রীর অন্যান্য বিষয়, তারা যে ঘরে কাজ করছে—সেটার মূল্যায়ন ইসলাম কীভাবে করছে। এই পুরো বিষয়টা যদি আমাকে স্কুলকলেজে শিখিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে আমি তো আজকে স্ত্রীকে এভাবে খোঁটা দিতাম না। আমি বুঝতাম যে, ইসলামের চোখে ঘরের কাজ বাইরের কাজ সমান সম্মানের ও মর্যাদার। ইসলামের চোখে আমি বাইরে যে উপার্জন করছি, আর আমার স্ত্রী ঘরে যে পরিমাণ টাকা বাঁচাচ্ছে—একই পরিমাণ মর্যাদার। মর্যাদায় কোনো পার্থক্য নেই। **আমার স্ত্রী ঘরে কাজ করে এটা যে পরিমাণ জরুরি, আমি বাইরে কাজ করাও একইরকম জরুরি।** কোনোভাবে আমি টাকা আয় করছি বলে, আমার কাজ বেশি জরুরি—এই টাকার মাপ ইসলাম মাপে না। এটা আমি কেন শিখিনি? কারণ আমাকে স্কুলকলেজে এগুলো শেখানো হয়নি।

মূল সমস্যা সিস্টেমের। এই সিস্টেমগুলো বদলে গেলে, সেক্যুলার সিস্টেমের বদলে ইসলামের সিস্টেম এলে আমাদের বোনেরা এ কথা বুঝতে পারবে যে, তারা অলরেডি ক্যারিয়ার করছে। তারা ফুলটাইম জব করছে। যে কাজ করার সামর্থ্য পুরুষের নেই, পুরুষের হরমোনই সে কাজ করতে দেয় না পুরুষকে।[১৩২] **সমাজ-দেশ-জাতিকে আমাদের নারীরা সার্ভিস দিচ্ছে সুস্থ-সবল, নীরব, রুচিবান প্রজন্ম উপহার দেওয়ার মাধ্যমে। দেশের জিডিপিতে মাসে ২০-৩০ হাজার টাকা যোগ করার জন্য ১২ লক্ষ বেকার পুরুষ এখনো রয়েছে। সুন্দর ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম উপহার দেওয়ার ক্ষমতা পুরুষের নেই।** নারীর নারীত্বের সবচেয়ে বড় দেশসেবা এটাই যে, সে আদর্শ ভবিষ্যৎ রেখে যাবে দেশের জন্য,

[১৩২] টেস্টোস্টেরন হরমোন এই 'বাচ্চা-পালা'র ঝোঁক কমিয়ে দেয়, যা বাবাদের বেশি। (Udry, 2000)

উম্মাহর জন্য।

সুতরাং আমাদের বোনদের বুঝতে হবে, তাদের ক্যারিয়ার হচ্ছে মূলত ঘরে। মানে, ঘরে তারা যে কাজগুলো করে, সেটাই তাদের আসল ক্যারিয়ার। সন্তান তাদের মূল ফোকাস। এটাই তাদের শরীরের সাথে যায়, তাদের মনের সাথে যায়। **পুরুষ ও নারীর ক্যারিয়ার একই হতে হবে, টাকার মাপেই ক্যারিয়ারকে মাপতে হবে—ব্যাপারটা আসলে পশ্চিমাবিশ্ব আমাদের শিখিয়েছে, তাদের নিজেদের প্রয়োজনে।** কিন্তু এটা পশ্চিমা নারীদের শেষ করে ফেলেছে। এতে নারীর শরীর, নারীর মন, পরবর্তী প্রজন্ম সব শেষ করে দিচ্ছে পশ্চিমে। আমরা অনুকরণ করলে আমাদেরও একই অবস্থা হবে।

ইসলাম কী বলে?

> "আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে, এবং জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবি-পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।"[১৩৩]

ইবনু হাজার আসকালানি (৭৭৩-৮৫২ হিজরি) রহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন, **এটিই প্রকৃত ও মৌলিক আদেশ। 'মুসলিম' মেয়েদের জন্য, যারা আল্লাহর সামনে নিজেদের সঁপে দিয়েছে।** আল্লাহর ও রাসুলের তরিকার সামনে নিজের জ্ঞান, নিজের বুদ্ধি, নিজের মনমানসিকতা সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছেন, তাদের জন্য এই আদেশ। সুতরাং আমাদের এটা বুঝতে হবে, আল্লাহর প্রকৃত ও মৌলিক আদেশই হচ্ছে, আমরা নিজ গৃহে অবস্থান করব এবং বিনা-প্রয়োজনে নিজেদের সৌন্দর্য বাইরে প্রকাশ করব না।

আল্লামা শাওকানি (১১৭৩- ১২২৯ হিজরি) রহ. বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যে বসবাস ও অবস্থান করতে আদেশ করেছেন। তবে হ্যাঁ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আম্মাজান সাওদা রা.-কে বলেন,

---

[১৩৩] সুরা আহযাব : ৩৩

"প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন।"[১৩৪]

সুতরাং নারীর প্রয়োজনে সে ঘর থেকে বের হতে পারবে, যেমন শিক্ষার জন্য হতে পারে, চিকিৎসার প্রয়োজনে। যেমনটা আমরা তাদের নিয়ে বাইরে বেড়াতে যাই; ঘোরাঘুরি করতে বের হই। পশ্চিমাবিশ্ব ও তাদের এ দেশীয় ঠিকাদাররা বলতে চায়, মুসলিমরা নারীদের ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখে। আমরা কি আসলেই আমাদের স্ত্রী-মাকে 'বন্দি' করে রাখি! কোথাও বন্দি করে রাখা হয় না। বরং তারা যখনই বলছে, তাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদের সাথে আমরা নিজেরাও যাচ্ছি তাদের সেফটির জন্য। তাদের যখন যেটা প্রয়োজন হচ্ছে, বললে আমরা এনে দিচ্ছি। তাদের শপিংয়ের প্রয়োজন হলে, তাদের সাথে নিয়ে শপিংয়ে যাচ্ছি। বাইরে বিভিন্ন পার্ক ও বিনোদন স্পটে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা ঘরে অবস্থান করতে বলেছেন, এটা নারীর জন্য মৌলিক হুকুম। কিন্তু প্রয়োজনে (যা ওপরে দেখলাম) ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তারা প্রয়োজনে বের হয়ে, নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করবেন, ব্যস হয়ে গেল। এখানে বন্দি করার মতো কোনো বিষয় নেই।

আসুন, আমাদের এতক্ষণের আলোচনা একটু পয়েন্ট আকারে দেখে নিই :

- মর্যাদার সাথে কামাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ওটা পুঁজিবাদের স্ট্যান্ডার্ড। Male value system—অর্থাৎ, পুরুষের সাথে নারীকে মাপা হচ্ছে। আমরা সেটা করব না। বরং নারী নারীর মতো, পুরুষ পুরুষের মতো।

- ইসলাম বলছে, রোজগার পুরুষের দায়িত্ব এবং পুরুষের জন্য ফরজ। নিষ্কর্মা ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য নাজায়েজ।

- নারীর জন্য জেনারেল রুল হলো, নারী ঘরে থাকবে, প্রয়োজন না হলে বাইরে যাবে না, এবং তারা ঘরের দায়িত্বগুলো পালন করবে।

- নারী-পুরুষের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন ও সমান গুরুত্বপূর্ণ, পরিপূরক। একটা ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ। এবং **এই আলাদা আলাদা দায়িত্বপালন যার যার ওপর ওয়াজিব।**[১৩৫]

এ ক্ষেত্রে আবু বকর ইবনু আবি শাইবা (১৫৯-২৩৫ হিজরি), আবু ইসহাক

[১৩৪] সহিহ বুখারি : ৪৭৯৫

[১৩৫] তাফসিরে মাআরেফুল কুরআন, সুরা নিসা : ৩৪ নং আয়াতের তাফসির

আল-যাওজানি ও ইবনু তাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিজরি) রহ.-এর মতটি ভারসাম্যপূর্ণ : যৌক্তিকভাবে শরিয়ার সীমায় যে কাজগুলো একজন মেয়ে ঘরে করে থাকে, সেগুলো করা তার দায়িত্ব। **প্রথাগতভাবে স্বামীদের জন্য যেসব কাজ ওই এলাকায় স্ত্রীরা করে থাকেন, সেগুলো করা স্ত্রীর কর্তব্য।** পরিবেশ, স্থান ও যুগভেদে এটা বদলাতে পারে। যেমন, গ্রামের মেয়ে এবং শহরের স্ত্রীর ঘরের কাজ একরকম হবে না। কারণ দেখা যায়, গ্রামের মেয়ে ঘরের অনেক কাজ করে, পুরুষেরা ধান কেটে নিয়ে আসে, সেই ধান সেদ্ধ করা, সেই ধান থেকে চাউল বের করা ইত্যাদি প্রোসেসিংগুলো করে থাকে। এই কাজটা গ্রামের মেয়েদের জন্য দায়িত্ব। কিন্তু শহরের মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা আছে, শহরের মেয়েরা কিন্তু এত কাজ করে না। দেখা যায়, ঘরে একজন কাজের লোক রেখে দেওয়া হয়, ঘর মোছা-টোছা এগুলো তারা করে দিয়ে যায়।

দলিল হিসেবে বলা যেতে পারে, ফাতিমা রা.-এর ব্যাপারে হাদিস থেকে জানা যায়, তিনি রুটি তৈরি করতেন, জাঁতা পিষে আটা বানাতেন। ইমাম কুরতুবি (ইনতিকাল : ৬৭১ হিজরি) রহ. বলেন,

> "স্ত্রী স্বামীর ঘরে কাজ করা ও ঘরের দেখভাল করার বিষয়টি **উরফ (প্রচলিত প্রথা)**-এর সাথে জড়িত। **উরফ-ও শরিয়তের একটি উৎস।**"

আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা. নবিজির দরবারে গিয়ে আরজ করেন, নারীদের পক্ষ থেকে আমি আপনার কাছে আগমন করেছি, (আল্লাহর রাসুল) আল্লাহ তাআলা আপনাকে নারী ও পুরুষ সবার কাছেই রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমরা আপনার ওপর ও আপনার প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছি। আমরা নারীরা তো ঘরের কাজ আঞ্জাম দিই, সন্তান গর্ভে ধারণ করি, তাদের লালনপালন করি। আমাদের ওপর (বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে) পুরুষদের ফজিলত রয়েছে। তারা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে। রোগী দেখতে যায়। জানাজায় শরিক হয়। একের পর এক হজ করে। সবচেয়ে বড় ফজিলতের ব্যাপার হলো, তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে পারে। তো, আমরা কীভাবে তাদের মতো ফজিলত ও সওয়াব লাভ করতে পারব? নবিজি তখন সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো দ্বীনি বিষয়ে তোমরা কি কোনো নারীকে এর চেয়ে সুন্দর প্রশ্ন করতে শুনেছ কখনো? এরপর নবিজি সেই নারীকে লক্ষ করে বললেন,

> তুমি আমার কথা ভালোভাবে অনুধাবন করো এবং অন্য মহিলাদেরও এ কথা

> জানিয়ে দাও যে, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, **তার সন্তুষ্টি কামনা করা ও তার পছন্দনীয় কাজ করা,** এ সকল আমলের সমতুল্য সওয়াব ও মর্যাদা রাখে।[১৩৬]

এর মানে, জামাতে নামাজ আদায়, রোগী দেখা, জানাজায় শরিক হওয়া, হজ করা, জিহাদ করা এ সবগুলো এক পাল্লায় আর নারীর স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, তার সন্তুষ্টি কামনা করা, তার পছন্দনীয় কাজ করা আরেক পাল্লায়। সমতুল্য, সমান মর্যাদা, আল্লাহর কাছে সমান সওয়াব। তার মানে **নারীর ঘরের এসব কাজ পুরুষের কাজের ও দায়িত্বের সমান মর্যাদার;** ইসলাম এগুলোকে ছোট করেনি, এগুলোকে ছোট করেছে পুঁজিবাদ। ইউরোপ ছোট করেছে। তাদের নিজের স্বার্থে। নারীকে বুঝিয়েছে, তোমার কাজগুলো ছোট, পুরুষের কাজগুলো বড়, অতএব তোমাকে পুরুষের কাজ করতে হবে, পুরুষের ক্যারিয়ারে আসতে হবে। অথচ **ওপরে ওঠা, বা, প্রভাবপ্রতিপত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আত্মতুষ্টি, আত্মমর্যাদা এ বিষয়গুলো বিশেষভাবে টেস্টোস্টেরন হরমোনের কারণে পুরুষের মধ্যে জন্ম নেয়।** যেহেতু নারীর মধ্যে টেস্টোস্টেরন হরমোন কম ও সীমিত (তাদেরও টেস্টোস্টেরন হরমোন আছে, কিন্তু অনেক কম)[১৩৭], তাই উপরিউক্ত বিষয়গুলো, অর্থাৎ **উঁচু হওয়া, বড় হওয়া, সবাইকে কন্ট্রোল করা, সবার ওপর খবরদারি করা—এগুলো নারীর মধ্যে কম।** শরীরের বিপরীতে গিয়ে নারীকে এসব করতে বাধ্য করা হচ্ছে, স্বাধীনতা-সমতার নেশায় বুঁদ হয়ে তারা নিজ শরীর-মনের ওপর জুলুম করছে।

আরেকটি হাদিস আমরা দেখি :

> "যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজানের রোজা রাখবে, লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।"[১৩৮]

সুতরাং এই উল্লেখিত কাজগুলো তার পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাকে পুরুষের সমান মূল্যায়ন করবেন। মূল বিষয় হলো, পশ্চিমাবিশ্ব নারীকে যেভাবে দেখে, এই দেখাটা নারীর জন্য কল্যাণকর না। বোনদের ঘরই মূলত তাদের ক্যারিয়ার। শুনতে খারাপ শোনাচ্ছে হয়তো, কিন্তু এটাই হচ্ছে

---

[১৩৬] শুআবুল ঈমান, বাইহাকি, হাদিস : ৮৩৬৯; মুসনাদে বাযযার, হাদিস : ৫২০৯

[১৩৭] পুরুষে ২৮০-১১০০, নারীতে ১৫-৭০ (ন্যানোগ্রাম/ডেসিলিটার)

[১৩৮] মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৬১; মুসনাদে বাযযার, হাদিস : ৭৪৮০; সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৪১৬৩

ইসলামের অবস্থান। আমরা এটা আপনাকে পৌঁছে দিতে বাধ্য। মানা না-মানা আপনার আর আপনার রবের ব্যাপার।

কারিকুলামে এগুলো কোথায়?

আমি সাংবাদিকতা করব না, তাহলে আমার জার্নালিজম পড়ে কী লাভ? আমি এমন একটা সাবজেক্ট পড়ছি, যেটি আমার সারাজীবন কাজেই লাগবে না। কেউ যদি ফিজিক্স পড়ে ব্যাংকে চাকরি করে, তাহলে কী লাভ তার ফিজিক্স পড়ে? তার ডিগ্রির প্রয়োজনটা কী? অথচ নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা প্রত্যেকের জন্য জরুরি ছিল, কিন্তু আমাদের কারিকুলামে বিষয়গুলো নেই।

- **নারীর মানসিক ও শারীরিক গঠন**, পছন্দ ও সময়ে সময়ে তাদের দেহ-মনে পরিবর্তন, সেক্স—একটা ছেলের জন্য এগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত কোনো শিক্ষা। একটি ছেলের জন্য জরুরি ছিল, সে নারী সম্পর্কে জানা, তেমনই নারীর পুরুষমানুষ সম্পর্কে জানা।

- **গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সমস্যাগুলো** সম্পর্কে প্রতিটা মেয়েকেই শেখানো। প্রতিটা মেয়ের জানা দরকার যে, গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সমস্যাগুলো কী কী। এগুলো বিস্তারিত জানা দরকার। কারণ, এগুলো তার জীবনের একটা মেজর ইভেন্ট।

- **প্যারেন্টিং** সম্পর্কে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান। আমরা প্রত্যেকেই প্যারেন্ট হব, তাহলে প্যারেন্টিং সম্পর্কে যে আধুনিক জ্ঞান, চাইল্ড সাইকোলজি, চাইল্ড এডুকেশন এগুলো জানা থাকা দরকার।

- **বয়স্কদের শরীর-মনস্তত্ত্ব-যত্ন**। প্রত্যেকের বাসায় বয়স্ক বাবা-মা থাকেন, সেই বয়স্ক বাবা-মায়েদের শরীর, তাদের মনস্তত্ত্ব, তাদের যত্ন; কারিকুলামে এগুলো কোথায়?

- **ধর্ম ও নৈতিকতার উচ্চতর জ্ঞান**। ধর্ম ও নৈতিকতার কারণে মানুষ বড় বড় সমস্যা থেকে দূরে থাকে, অ্যালকোহল, একাধিক যৌনসঙ্গী ইত্যাদি যত রিস্কি লাইফস্টাইল থেকে দূরে থাকে। **'অ্যাজ এ কমিউনিটি' অন্য ধর্মের তুলনায় মুসলিমদের মাঝে...**

  ➡ **অ্যালকোহল পানের হার কম। মাদকাসক্তির হার কম।** (Ghandour

2009, Amundsen 2006, Abu-Ras 2010)

➡ জুয়ার হার কম। (Ghandour, 2013)

➡ ব্যভিচার কম। (Adamczyk, 2012)

➡ ধর্ষণ কম।

➡ চ্যারিটি বেশি।[১৩৯]

কিন্তু কারিকুলামে ধর্ম ও নৈতিকতার জ্ঞান কোথায়? বরং ধর্মকে আরও অপ্রাসঙ্গিক করে তোলা হয়েছে বর্তমান কারিকুলামে। তার মানে যারা ধর্মহীন কারিকুলাম করেছে তারা চায়, ধর্ম যেসব সমস্যাকে বাধা দিচ্ছে, সেগুলোতে সমাজ সয়লাব হয়ে যাক। অ্যালকোহল-জুয়া-ব্যভিচার-ধর্ষণ বেড়ে যাক।

- **নিজের শরীরকে জানা ও প্রাথমিক মেডিকেল জ্ঞান।** নিজের শরীরকে আমরা কয়জন জানি? নিজের শরীর ও প্রাথমিক মেডিকেল জ্ঞানগুলো কি আমাদের জানার দরকার নেই?

- **জমি বণ্টন ও ভূমির টুকটাক আইন, দেশের টুকটাক আইন, মামলা করা, জিডি করা।** আমাদের বাবা-মা একসময় মারা যাবেন, তাদের সম্পত্তি আমরা কে কতটুকু পাব না-পাব—এগুলো তো আমাদের কারিকুলামে শেখানোর কথা, কিন্তু এগুলো কোথায়?

- **নাগরিক হিসেবে আপনার প্রাপ্য অধিকার** কী কী। আমি একটা দেশের নাগরিক, আমি একটা সরকারকে বসিয়েছি ক্ষমতায়, এই সরকারের কাছে আমি ঠিক কী কী পাই? আমি পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিই; একশ টাকার একটা জিনিস কিনলে, পনেরো টাকা আমি সরকারকে দিই, এই পনেরো টাকা দিয়ে সরকার কী করছে, এই হিসেব কি আমি নিতে পারব না? আমার তো সেই অধিকার আছে, কী কী অধিকার আমি পাব রাষ্ট্রের কাছ থেকে—এগুলো তো আমাদের শেখানো হয়নি।

---

[১৩৯] Muslims give more to charity than others, UK poll says [NBC News 2013]

We found that Muslim Americans gave more to charity, donating an average of $3,200, in 2020, versus $1,905 for other respondents.

US Muslims gave more to charity than other Americans in 2020 [Siddiqui, Lilly Family School of Philanthropy 2021]

এর মানে, টোটাল কারিকুলামে নারী-পুরুষকে যা শেখানো হচ্ছে, পুরোটাই বকওয়াস। বাস্তব জীবনে এর কোনো উপযোগিতা নেই, কোনো কার্যকারিতা নেই। একটা অহেতুক সময় নষ্ট করছি জাতিগতভাবে। মেডিকেল ও ইনজিনিয়ারিং স্টুডেন্টদের ওপর একটি রিসার্চ হয়েছিল। দেখা গেছে, ৫২% ইনজিনিয়ারিং-পড়ুয়া মেয়ে-স্টুডেন্ট তারা কর্মক্ষেত্রে যায় না।[১৪০] ফলে তারা আল্টিমেটলি গৃহিণী হয়ে যাচ্ছে। গৃহিণী হওয়ার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষাটা কোথায়! এখানে কি শিক্ষা লাগবে না? এখানে পুষ্টিবিদ্যার জ্ঞান লাগবে, চাইল্ড সাইকোলজি, চাইল্ড এডুকেশন লাগবে, হোম ইকোনমিক্সের বিষয় আছে, এখানে বিভিন্ন সাংসারিক খরচ-ম্যানেজমেন্টের বিষয় আছে, একাউন্টিংয়ের কিছু বিষয় আছে। এই পুরো বিষয়টা কেন একজন মেয়েকে শেখানো হচ্ছে না, যে কিনা আল্টিমেটলি গৃহিণীই থাকবে, চাকরিতে আসবে না। কারিকুলামে পুরো অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা দিয়ে ভরে রেখেছে। প্রাসঙ্গিক কোনো শিক্ষা, যেটা তার লাগবে সেটা নেই।

উচ্চশিক্ষার নামে, অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা

---

[১৪০] বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ইন ডেভেলপমেন্টের পক্ষে বিডিওএসএনের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স ও মেকাট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান লাফিফা জামাল স্বল্পপরিসরে করা একটি জরিপে দেখেছেন, প্রকৌশলবিদ্যায় নারীদের শিক্ষার হার যত বাড়ছে কাজে অংশ নেওয়ার হার সেভাবে বাড়ছে না। তিনি বললেন, ২০১৫ সালে এই ইন্ডাস্ট্রিতে মাত্র ৯ শতাংশ নারী ছিলেন। বিডিওএসএন এবং সরকারের পক্ষ থেকে অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ, বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তার পর ২০১৭ সালে এসে এর পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ১১-১২ শতাংশ, কিন্তু প্রকৌশলশিক্ষায় নারী ছিল প্রায় ২৫ শতাংশ।

২০০৬ থেকে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলে (বিএমডিসি) নিবন্ধিত ৩৪ হাজার ৬৯৭ জন চিকিৎসকের তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্র্যাক জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ ও আইসিডিডিআরবির গবেষকেরা দেখেছেন, তাদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ পুরুষ চিকিৎসক ও ৫২ শতাংশ নারী চিকিৎসক। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে অনলাইন মেডিকেল জার্নাল *PLOS ONE*-এ প্রকাশিত গবেষণায় এমবিবিএস শেষ বর্ষের সরকারি মেডিকেলের ২০৭ জন ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ১০৭ জন ছাত্রীর ওপর জরিপ করা হয়। জরিপে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের ১৭ শতাংশ বলেছিলেন, বিয়ের বাজারে এই পেশার দাম আছে। এই গবেষণায় ছাত্রীরা বিয়ের পর পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পালটে যাওয়া, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার সমস্যাসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথাও তুলে ধরেন। এই গবেষণাপ্রবন্ধেই উল্লেখ করা হয়েছে, এমবিবিএস পাস করলেও অনেক নারী চিকিৎসক পেশা চর্চার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান, অনেকে পেশা ছেড়ে দেন। প্রতিবেশী দেশ ভারতেও এই প্রবণতা আছে। [মাকসুদা আজীজ (১৮ অক্টোবর ২০১৯), নারীরা শিক্ষিত হয়েও বেকার, প্রথম আলো]

এই পাঁচ বছরের পড়াটা তার না পেশাগত, না পারিবারিক—কোনো কাজেই লাগল না।

- অহেতুক কিছু স্ট্রেস, পরীক্ষা পাশের টেনশন ইত্যাদি ধকল গেল।

- সরকারি খরচের নামে, জনগণের টাকা একবার ব্যয় হলো তাকে ডিগ্রি দেওয়াতে, আরেকবার ব্যয় হলো, পেশার ট্রেনিং-এ। যেমন, একজন লোক ফিজিক্স পড়ে ব্যাংকে চাকরি করতে এসেছে, এখন ব্যাংকের জন্য তাকে আরও ছয়মাস ট্রেনিং দেওয়া লাগবে। অথচ, ভার্সিটিতে কিন্তু ব্যাংকিং নামে একটা সাবজেক্ট ছিল, তাহলে ব্যাংকিং যে পঞ্চাশটি ছেলে পড়েছে, সেই পঞ্চাশটি ছেলেকে ব্যাংকে নিলে পরে, অন্যদের মতো অতিরিক্ত ট্রেনিংটা দেওয়া লাগত না। তাহলে দুবার জনগণের টাকা ব্যয় হচ্ছে।

- পাঁচটা বছর জীবন থেকে লস হলো—কোনো কাজের শিক্ষা না, কেবল ডিগ্রির পেছনে। জাস্ট ডিগ্রিটা লাগল চাকরিতে, শিক্ষাটা না। অথচ সিস্টেমে পরিবর্তন হলে, এই পাঁচটা বছর বাঁচানো যেত। ব্যাংকিং-এ পড়া ছেলেগুলোকে ব্যাংকে ঢুকালেই হতো। পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনে পড়া ছেলেগুলোকে ফিবছর এডমিন ক্যাডারে নিলেই হতো। গবেষক প্লাস স্কুলকলেজে ফিজিক্সের টিচার প্রতিবছর কতজন লাগে, হিসেব করে ততজনকে ফিজিক্স পড়ালেই চলত।[১৪১]

মোটকথা এটা বলতে চাচ্ছি, এই যে আমাদের উচ্চশিক্ষা, এটা পুরোটাই একটা অপ্রাসঙ্গিক শিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেডিকেল-ইনজিনিয়ারিং এগুলো ছাড়া। বাকি যে সাবজেক্টগুলো ভার্সিটিতে পড়ানো হয়, অধিকাংশই তো সেই পেশাটা করে না। সেই সাবজেক্ট রিলেটেড পেশায় তো সে যায় না। তাহলে পাঁচ বছর যে তাকে বসিয়ে রাখা হলো, যেটি একজন নারীর জীবনের মূল অংশ (২০-৩০ বছর); যে সময় গর্ভধারণ তার জন্য নিরাপদ, যে সময় নরমাল ডেলিভারি হওয়ার সম্ভাবনা তার জন্য সবচেয়ে বেশি। যে সময় সন্তান সুস্থ, সবল ও স্বাস্থ্যবান হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এই সময়টাতেই একজন নারীকে পাঁচ-পাঁচটা বছর ভার্সিটিতে রেখে দেওয়া হলো এমন শিক্ষার জন্য,

---

[১৪১] "প্রচলিত উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থায় মর্যাদা নয়, কেবল ডিগ্রি অর্জন সম্ভব।" বাংলা একাডেমির সেমিনারে শিক্ষাবিদরা; ২৬ আগস্ট, ২০১৫, দৈনিক ইত্তেফাক।

যেটি তার কোনো কাজেই এলো না। এই হচ্ছে, বর্তমান শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা।

আমি আপনাদের সামনে পুরো পিকচারটা তুলে ধরলাম, আপনারা হতাশ হবেন, এটা জানি। কিন্তু আপনাদের এগুলো জানার দরকার। মানতে না পারলাম, কিন্তু জানা থাকা দরকার। অনেকের হয়তো বিভিন্ন ওজর আছে; কন্যার কথা, বাবা-মার বিরুদ্ধে তো বিদ্রোহ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদেরকে পড়তে হচ্ছে, আমাদের হয়তো চাকরিও করতে হবে। কিন্তু মূল বিষয়টা জানা থাকা লাগবে, আমাকে-আপনাকে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

এবং ইসলাম কী বলে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল কী বলেন, পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম কী বলেছেন, ইসলামের কোন পিকচারটা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—এগুলো তো আমাকে জানতে হবে। আমি মানতে পারি আর না পারি। সুতরাং আপনারা কষ্ট পাবেন না, হতাশ হবেন না। মূল বিষয়টা জানা থাক, এবং জীবনের যে পর্যায়েই পারি, আমি মূল বিধানের ওপর ওঠার চেষ্টা করব। বাধ্য হয়ে আমি যেটা করছি, কন্যার কথা, আমার বাবা আমাকে ভার্সিটিতে পড়াবেন, এখন আমি তো বাবার বিরোধিতা করতে পারছি না। বাবার খাই, বাবার পরি, সে ক্ষেত্রে তো আশা রাখি আল্লাহ তাআলা আমাকে মাফ করে দেবেন। বাধ্য হয়ে বান্দা যদি কোনো কাজ করেন, আল্লাহ মাফ করে দেন। কিন্তু আমাকে মূল বিষয়টা জেনে সচেতন থাকতে হবে। যেন যেকোনো সময় সুযোগ পাওয়ামাত্রই আমি এটা থেকে বাঁচতে পারি।

এখানে দেখানো হয়েছে যে, মূলত পরিবারগঠনকে পিছিয়ে দিয়ে, ছেলেদের সর্বনাশ করা হচ্ছে, মেয়েদেরও সর্বনাশ করা হচ্ছে। ফলে অশান্তি, হতাশা, অপরাধময় একটা জীবন কাটাচ্ছে লাখ লাখ নারী-পুরুষ। এবং এগুলোর ওপর ভিত্তি করে কীভাবে তারা ব্যবসা করছে, এই চার্টে তা-ই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মেয়েদের কারিকুলাম যেমন হওয়া দরকার ছিল :

- যেকোনো লেভেলের একটা বাংলা বই পড়ে, তার রস বোঝার যোগ্যতা।
- একটা মানসম্পন্ন আর্টিকেল বাংলায় ও ইংরেজিতে লেখার যোগ্যতা।
- যেকোনো লেভেলের একটা ইংরেজি বই পড়ে, তা বোঝার যোগ্যতা।

- আরবি ভাষা, কুরআন-হাদিস-ফিকহ।
- প্যারেন্টিং বা সন্তান পালন।
- জেরিয়াট্রিক্স বা বার্ধক্যের যত্ন।
- দাম্পত্যজীবনের বিভিন্ন রসায়ন।
- প্রাথমিক মেডিকেল সায়েন্স ও শারীরতত্ত্ব।
- খাদ্য ও পুষ্টি।
- ভোকেশনাল কিছু একটা—সূচিশিল্প বা ফুলের কাজজাতীয় কিছু।
- কম্পিউটার ও ফ্রিল্যান্সিং।
- ইতিহাস-দর্শন-ভূগোলের সব বিষয়ে যেন স্পষ্ট ধারণা থাকে।
- বিজ্ঞানের সব শাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।
- অঙ্কের সব শাখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা।

এরকম একটা কারিকুলাম মেয়েদের হওয়ার দরকার ছিল। যে কারিকুলামটা সে তার ব্যক্তিগত লাইফে প্রয়োগ করতে পারবে। তার কাজে লাগবে। অকাজের জিনিস শিখিয়ে, তার ব্রেইন-বুদ্ধি খরচ করে কী লাভ? আমি কিন্তু কোনো বোনকে ক্যারিয়ারের জন্য 'তৈরি হতে' নিরুৎসাহিত করছি না। আপনাদের রেডি থাকতে হবে, যদি কখনো জীবনে এমন পজিশনে পড়ে যান যে, আপনার নিজেকেই উপার্জন করতে হচ্ছে, তখন যেন আপনি কিছু করতে পারেন, এরকম চালু হতে হবে আপনাকে।

পরিবার নিজেই ফুলটাইম জব

আমাদের অনেক চাহিদা পরিবার পূরণ করে। আপনাকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই। স্ত্রীর সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটালে, একসাথে থাকলে, স্ট্রেস চলে যায়। মনের দুঃখদুর্দশাগুলো শেয়ার করা যায়। স্ত্রী স্বামীকে সাহস দেয়। যেমন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম ওহি পেলেন, তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। আম্মাজান খাদিজা রা.-কে ডেকে বলেছেন : যাম্মিলুনি, যাম্মিলুনি (আমাকে ঢাকো, আমাকে ঢেকে দাও)। আম্মাজান বললেন, ভয় পাবেন না, আপনি ভালো মানুষ, আপনার সাথে খারাপ কিছু হবে না। আপনি গরিব

মানুষের উপকার করেন, দানখয়রাত করেন। আপনার সাথে আল্লাহ খারাপ কিছু করবেন না। এই যে দেখুন—স্ত্রীর সান্ত্বনা।

এখন পশ্চিমে যাদের পরিবার নেই, তারা কী করে? এখন তারা কাডলিং (cuddle—বুকে জড়িয়ে রাখা) সার্ভিস নিচ্ছে। মানে, একটা মেয়েকে প্রতি ঘণ্টায় দশ ডলারের মতো দেবে, আর ওই মেয়েটাকে সেবাক্রেতা পুরুষটা জড়িয়ে ধরে গল্প করবে। নিজের দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট এগুলো শেয়ার করবে, গল্প করবে; মেয়েটা তাকে সাহস দেবে, হিম্মত দেবে। অতিরিক্ত কিছু করতে পারবে না। অতিরিক্ত কিছু করলে অতিরিক্ত চার্জ।

মানে, স্ত্রী থাকলে যে কাজটা করত, এই কাজটাকে ওরা ব্যবসা বানিয়েছে। মা সন্তান গর্ভে ধারণ করত, এখন ওরা সারোগেসি (surrogate mother) তথা, গর্ভ ভাড়া দেওয়াচ্ছে। অর্থাৎ, পরিবারকে ভেঙে দিতে পারলে, নতুন নতুন চাহিদা পাওয়া যাবে ব্যবসা করার জন্য। কেন নতুন নতুন ব্যবসা খুলতে হবে?[১৪২] পৃথিবীর সব অঞ্চলে ব্যবসার ক্ষেত্রে ভোক্তার সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এমনকি যেসব ব্যবসা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক, সেগুলোও পৃথিবী নামক দ্বীপের সীমাবদ্ধতার ফাঁদে পড়ে যায়। **এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ও লাভের ধারা বজায় রাখতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাতে টাকা বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এজন্য ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন মার্কেট তৈরি বা ব্যবসাকে বহুমুখীকরণ করে থাকে।**

পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য মানুষ ত্যাগ করে, sacrifice করে, যা ভোগকে কমায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আদর্শের দ্বারা তৈরি হবে স্বার্থপর মানুষ। যার ফোকাস হবে শুধু নিজের ভোগ। পরিবারের পিতা সন্তানকে deterred comsumption শেখায়, কম ভোগ করতে শেখায়। যেমন, আমার আমার কলিজার টুকরা আম্মু খাদিজা মাঝেমধ্যে বলে, আব্বা এটা করতে হবে, ওটা কিনে দাও। আমি বলি : না এখন না, পরে। হয়তো সেটা কিনে দিই আল্টিমেটলি, কিন্তু দুয়েকদিন পরে। তাহলে এই যে, 'না পাওয়া'; না পেতে না পেতে অভ্যস্ত হওয়া। এর ফলে হয় কি, মানুষের মন হঠাৎ করে কোনো কষ্ট পায় না। দেখুন না, এখনকার বাচ্চারা এ প্লাস পায় না বলে আত্মহত্যা করে। কারণ, ও সারাজীবন সবই পেয়েছে, এখন এই প্রথম সে একটা জিনিস পায়নি। ব্যস, আত্মহত্যা করেছে। তাহলে

---

[১৪২] মোহাইমিন পাটোয়ারি, ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

এই যে, বাচ্চাকে শেখানো যে—না বাবা, পৃথিবীতে সব জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। এই শেখানোটা বাবা শেখায়।

যে পরিবারে বাবা থাকে না, সে পরিবারের সন্তানরা হয় compulsive consumer. সে ভোগ করতেই থাকে, করতেই থাকে। এরকম মানুষই তো দরকার পুঁজিবাদের। সারা পৃথিবীর সব মানুষ যদি এরকম হয়ে যায়, তাহলে তো পুঁজিবাদের প্রভাব আরও বাড়ল, বিক্রি আর বিক্রি, লাভ আর লাভ। তাই তারা চাচ্ছে, পরিবার যেন না থাকে, সন্তান যেন বাবাকে কাছে না পায়।

সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীবাদ প্রভৃতি ব্যবহার করে : পরিবার ভেঙে দাও, দুর্বল করে দাও, পরিবারগঠন পিছিয়ে দাও, লিভ-টুগেদারভিত্তিক ভঙ্গুর পরিবার (Fragile family) তৈরি করো। বাবাকে সন্তান যেন না পায়, নিজের ভোগ স্যাক্রিফাইস করার মতো কেউ যেন না থাকে। পুঁজিবাদীরা আপনার শরীরের তোয়াক্কা করে না, আপনার সন্তানের কী হলো না হলো, এর তোয়াক্কা করে না। তারা শুধু চায়—আপনার সার্ভিস।

এজন্যই এরা সবাই মিলে পরিবারের পেছনে লেগেছে। পরিবার একটা প্রতিষ্ঠান। অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মতো এরও ম্যানেজার প্রয়োজন, এডমিন প্রয়োজন, ফুলটাইম প্রয়োজন। অফিস-আদালতের মতো প্রতিষ্ঠান তো একটা সময়ের পর বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরিবার ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে। আর এখানেই ফুলটাইম জব নেই? পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য মুখরোচক সব স্লোগান ব্যবহার করে নাড়িয়ে দিচ্ছে পরিবারের মূল খুঁটি নারীদের। দেখুন কর্মজীবী নারীর শিশুকে সামলাতে ঠিকই কিন্তু আরেক নারীকে (দাদি-নানি-বুয়া) প্রয়োজন পড়ছে। আপনার সন্তান অন্যজনের মনমতো বড় হচ্ছে, তার ভাষাগঠন, তার ব্যক্তিত্বগঠন, তার মন-রুচি-মেধা গঠন হচ্ছে অন্য কারও হাতে। হয়তো সেটা আপনার পছন্দ নাও হতে পারে। নেপোলিয়নের কথাটা খুব ব্যবহার হয় নারীশিক্ষার পক্ষে : আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের শিক্ষিত জাতি উপহার দেবো। শিক্ষিত মায়ের শিশু যদি বড় হয় অশিক্ষিত বুয়ার হাতে, তবে এই কথার আর ভিত্তি রইল কোথায়?

পরিবার আধখ্যাঁচড়া, জোড়াতালি, আগপিছ করে নেওয়ার মতো হালকা কাজ না। মায়ের পূর্ণ মেধা-শ্রম-চিন্তন-ফিকির-জ্ঞান দাবি করে একটা পরিবার। পরিবারের স্বার্থেই এবং নারীর স্বার্থেই নারীকে ঘরের দুনিয়া সামলাতে হবে,

আর পুরুষকে বাইরের দুনিয়া সামলাতে হবে। এটাই উভয়ের শরীরবান্ধব, মনবান্ধব, সমাজবান্ধব।

কিন্তু পেশাগত প্রস্তুতি জরুরি

এরপরেও বোনদের জন্য কিছু পেশাগত প্রস্তুতি খুব জরুরি। স্পেশাল পরিস্থিতির জন্য। কথার কথা, যদি কারও স্বামী মারা যায়, বা, নিজেকে উপার্জন করতে হয়—এমন কোনো সিচুয়েশন যদি আসে, তখন যেন নিজে উপার্জন করতে পারে। যেমন :

- অনলাইনে ব্যবসা এবং মার্কেটিং-এর বিষয়-আশয়। এমন না যে, টাকার মাধ্যমে আপনি অনেক সম্মান চাচ্ছেন, অনেক খ্যাতি চাচ্ছেন। বরং যদি কারও আসলেই প্রয়োজন হয়, তাহলে সে অনলাইনে পর্দার সাথে ব্যবসা করতে পারবে।
- শিশু প্রতিষ্ঠান (কিন্ডারগার্টেন) বা গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা। বিভিন্ন নুরানি স্কুল, মাদরাসা ইত্যাদিতে শিক্ষকতা করা। সামনে ডে-কেয়ার জিনিসটা মেইনস্ট্রিম হয়ে যাবে। এসব জায়গায় দ্বীনি বোনেরা থাকলে পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীনের ওপর গড়ে তোলার একটা মওকা হতে পারে। এখানেও একই কথা, এটা প্রয়োজনের কারণে করবে; কিন্তু আত্মমর্যাদার জন্য না, স্বাবলম্বী হওয়া, নারী ক্ষমতায়নের জন্য না। বরং যদি তার আসলেই প্রয়োজন হয় করার জন্য, তাহলে সে করতে পারবে।
- ফ্রিল্যান্সিং। বোনদের জন্য এটাও একটা আয় করার চমৎকার জায়গা।
- বুটিক ও এমব্রয়ডারি।
- ব্যক্তিগত চেম্বার। (নারী ও শিশু রোগী) আমাদের ডাক্তার বোন যারা আছেন, এটা তাদের জন্য।

এগুলো হচ্ছে তাদের আর্ন করার জায়গা। যদি সিচুয়েশন এমন হয় যে, তাকে পেশায় আসতে হচ্ছে। পুরুষমানুষ নেই, বা পুরুষের পেশাটা যথেষ্ট হচ্ছে না—এমন যদি হয়, সে ক্ষেত্রে তারা স্বামীকে হেল্প করতে পারবে। এটা আলেমদের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া জরুরি। কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করা, স্বামীর অনুমতি থাকা—এ বিষয়গুলোর শর্ত আছে এখানে। আসলেই এটা আপনার জন্য জরুরি কি না শরিয়তের দিক থেকে, এটা একজন আলেম

দেখবেন। এবং সেইসাথে স্বামীর অনুমতি আছে কি না। **এই ক্যারিয়ার করতে গিয়ে, পরিবারে বোনদের 'মূল আল্লাহপ্রদত্ত ক্যারিয়ার'-এর কোনো ক্ষতি হচ্ছে** কি না, সে বিষয়টা লক্ষ রাখতে হবে।

সুতরাং বোনদের ফোকাস হওয়া উচিত, ডিগ্রি নেওয়ার শিক্ষার চেয়ে, পেশামুখী ও Home management-মুখী শিক্ষা নেওয়া।

আসল 'ক্যারিয়ার-ওম্যান'

একজন নারী মানবজাতির জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, দ্বীনের জন্য ও নিজের জন্য সর্বোচ্চ যা করতে পারে, তার নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। **আল্লাহ তাআলা আপনাকে একজন নারী হিসেবে যে বিশেষ বিশেষ কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন, ওই জিনিসটার সর্বোচ্চ ব্যবহার করা। যা কোনো পুরুষকে দিয়ে হবে না। কোনো পুরুষ কোনোদিনও সেই দায়িত্ব, সেই অবদান, সেই অর্জন করতে পারবে না। সেটা হচ্ছে—যতজন সম্ভব আদর্শ সন্তান দুনিয়াতে রেখে যাওয়া।**

আজকে আমরা আম্মাজান খাদিজা রা.-এর কথা বলি। বিখ্যাত যুক্তি : তিনি ব্যবসা করতেন, আমিও ব্যবসা করব। আম্মাজান আয়েশা রা.-কে সামনে আনি : তিনি আলেমা ছিলেন, লেকচারার ছিলেন, প্রফেসর ছিলেন। আমিও লেকচারার হব, প্রফেসর হব।

কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করুন, জান্নাতি নারীদের সর্দার হলেন, ফাতিমা রা.।[১৪৩] এটা কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হওয়ার কারণেই? অর্থাৎ, পবিত্র রক্তসম্পর্কের দরুন? নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? রক্তসম্পর্কের কারণে কেউ জান্নাতে যাবে না, এটা নবিজিই বলেছেন নিজের মেয়েকে : "হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার ধনসম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না।"[১৪৪]

বরং জান্নাতের সর্দার তিনি এই কারণে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে, সারা পৃথিবীতে যত নারী আসবেন—সবার আইকন হচ্ছেন

---

[১৪৩] সহিহুল বুখারি : ৩৬২৩; সুনানুত তিরমিজি : ৩৭৮১; সুনানুন নাসায়ি : ৮২৪০

[১৪৪] সহিহুল বুখারি ২৭৫৩; সহিহ মুসলিম : ২০৬; সুনানুন নাসায়ি : ৬৪৪০

তিনি। আদর্শ, যার মতো হতে হয়, টার্গেট। কিন্তু ফাতেমা রা. না কোনো প্রফেসর ছিলেন, না সিইও ছিলেন, না ব্যবসা করেছেন আর না চাকরি করেছেন। বরং তিনি যেটা করেছেন তা হলো—তিনি একজন আদর্শ স্ত্রী হয়েছেন; একজন আদর্শ মা হয়েছেন এবং একজন আদর্শ মেয়ে হয়েছেন।

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'মেয়ে'। বিশ্বের সকল মুসলিমাকে এমন আদর্শ 'মেয়ে' হতে হবে। আমরা একটা ঘটনা জানি : মক্কাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দাওয়াতের কাজ করছেন। অনেক মানুষ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে থুথু দিয়েছে, আবর্জনা দিয়েছে, মুখে মাটি মেরেছে। প্রখর রোদে ঘর্মাক্ত দেহে, ক্লান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে, মনে কষ্ট, শরীর অবসন্ন—এরকম অবস্থায় ঘরের সামনে এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছেন। তখন ছুটে এসেছেন ফাতিমা রা.। বাবার চেহারা থেকে মাটি মুছে দিচ্ছেন, আর কাঁদছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন : "হে আমার মেয়ে! তুমি কষ্ট পেয়ো না। তোমার বাবার এই দ্বীন একদিন প্রত্যেক কাঁচা-পাকা ঘরে পৌঁছে যাবে।" দেখুন, মেয়ে হিসেবে তার যত দায়িত্ব রয়েছে, তিনি তা পালন করেছেন।

ফাতিমা রা.-এর স্বামী ছিলেন হজরত আলি রা.-এর মতো মানুষ। যিনি খলিফা ছিলেন। রাসুলের যুগেই তিনি কাজি ছিলেন; অর্থাৎ, বিচার করতেন। পরবর্তী খলিফাদের যুগেও তিনি বিচার করতেন। ছিলেন সেনাপতি। ছিলেন নবিজির মন্ত্রী। ছিলেন আলেম বা শিক্ষক। **আলি রা. 'আলি' হতে পেরেছেন, কারণ, তাঁর ঘরে একজন 'ফাতিমা' ছিলেন।** ঘর নিয়ে, হাসান-হুসাইনকে নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হয়নি। ফাতিমা রা.-ই সব ম্যানেজ করে ফেলতেন। আলিকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন 'আলি' হয়ে ওঠার জন্য।

হাসান-হুসাইনকে জন্ম দেওয়া, তাদের বড় করে তোলা। হাসান-হুসাইন যেন আদর্শ মানুষ হতে পারে, রুচিবান মানুষ হতে পারে, আল্লাহওয়ালা হতে পারে, আলেম হতে পারে—এগুলো সব ফাতিমা রা. দেখতেন। এটা একটা ফুলটাইম কাজ। বুয়ার কাছে রেখে, নানি-দাদির কাছে রেখে আমার সন্তান আমার 'মনের মতো' করে গড়া সম্ভব না। এইজন্য আলি রা.-কে আর টেনশন করতে হয়নি। আলি রা.-কে 'আলি' হয়ে ওঠার জন্য টেনশন-ফ্রি করে ছেড়ে দিয়েছেন। **ফাতিমা রা. তার ঘরের দায়িত্বগুলো পালন করেছেন বলেই, আমরা একজন 'আলি'-কে পেয়েছি। আমরা হাসান রাদি.-কে পেয়েছি,**

যিনি মুসলিমদের আন্তঃউম্মাহ মতভেদে আদর্শ। হুসাইন রাদি.-কে পেয়েছি, যিনি জালেম শাসকের বিপরীতে উম্মতের অনুসরণীয় আদর্শ। রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন। কেন পেয়েছি? কারণ তারা এমন এক কোলে বড় হয়েছেন, ফাতিমা রা. 'মা' হিসেবে তার যে দায়িত্ব ছিল, সে দায়িত্ব পালনে কোনো ত্রুটি করেননি। তিনি তার দুই সন্তানকে আলেম হিসেবে, ফকিহ হিসেবে, মুজাহিদ হিসেবে তৈরি করেছেন।

বিপরীতটা ভাবুন, ফাতিমা যদি 'আলি'-কে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতেন। যদি পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজেই 'আলি' হয়ে উঠতে চাইতেন। গত ১৪০০ বছরে সকল মুসলিমা যদি এভাবে ভাবতেন। 'আলি'-এর ক্যারিয়ারকে নিজের 'ক্যারিয়ার' মনে করতেন। আলেম-ফকিহ-বিচারক-সেনাপতি হওয়াকে ক্যারিয়ার মনে করতেন। যেমনটা আজ অনেক আধুনিক উস্তাযা প্রচার করছেন। তাহলে কী হতো? আর এই কারণেই ফাতিমা রা. জান্নাতি নারীদের সর্দার। আদর্শ মা-মেয়ে-স্ত্রী তার ক্যারিয়ার, ফুলটাইম ক্যারিয়ার। আধাখ্যাঁচড়া না, বল-পাসিং না। আজ আমরা জান্নাতে যেতে চাই, কিন্তু সর্দারকে অনুসরণ করতে চাই না। কী আজিব আমাদের চাওয়াগুলো!

ফাতিমা রা. ছাড়া আরও তিনজনের ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন, যাদের কেউই সিইও-প্রফেসর নন। তিনি বলেছেন, "চারজন নারী নারীশ্রেষ্ঠা—মারিয়াম আ., আসিয়া রা, আম্মাজান খাদিজা রা., ফাতিমা রা.।"[১৪৫]

মারিয়াম আ. কেন শ্রেষ্ঠা? কী তার ক্যারিয়ার? একজন আদর্শ মা। এই মাতৃত্বের কারণে তাকে কী পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে, ভাবুন! সমাজের কটুকথা, পিতৃহীন সন্তানকে বড় করে তোলা, আলেম বানানো। ইহুদি বড় বড় আলেমদের সাথে ঈসানবি বাহাস করতেন কিশোর বয়সে। একজন নবির মায়ের যা যা দায়িত্ব, তা পইপই করে আদায় করেছেন বলেই তিনি শ্রেষ্ঠা। অন্য কোনো কারণ তো নেই, নাকি?

হজরত খাদিজা রা. কেন শ্রেষ্ঠা? একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রী, শ্রেষ্ঠ মা। তাকে কর্পোরেট আইকন বানানোর মতো ডাহা মিথ্যা কথা মানুষ কীভাবে বলে?

---

[১৪৫] মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪১৬০; মিশকাতুল মাসাবিহ : ৬১৮১; সহিহুল জামি : ৩৩৩৬; হাদিসটি সহিহ।

তিনি পুরুষ মানুষের সাথে বোর্ড মিটিং করতেন? ফ্রি-মিক্সিং অফিস করতেন? ইসলামগ্রহণের আগেও তো তিনি এসব করেননি, যেসব অপবাদ তাকে দেওয়া হচ্ছে। এসব তার নামে নির্জলা অপবাদ, তিনি জাহেলিয়াতের যুগেও ছিলেন খাদিজাতুত তাহিরা (পবিত্রা)। তিনি শ্রেষ্ঠা কারণ—

- নবির স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। সান্ত্বনা দেওয়া, হিম্মত দেওয়া, গরিবির ওপর সবর, হেরা গুহায় খাবার নিয়ে যাওয়া।

- সমস্ত সম্পদ দাওয়াতের কাজে স্বামীর জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

- একহাতে গৃহস্থালি সামলেছেন, যে ব্যস্ততা সামলাতে তার মৃত্যুর পর প্রয়োজন পড়েছে বয়স্কা আম্মা সাওদা রা.-কে।

- ফাতিমা রা.-এর মতো আরেক নারীশ্রেষ্ঠাকে গড়ে তুলেছেন। উসমান যিন-নুরাইনের 'দুই নুর'-কে (রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম, উসমান রা.-এর দুই স্ত্রী) গড়ে তুলেছেন।

হজরত আসিয়া রা. কেন শ্রেষ্ঠা? তিনি দ্বীনের ব্যাপারে কোনো আপস করেননি। **তাকওয়া, পরহেজগারি ও ঈমানের ব্যাপারে কোনো আপস করেননি।** স্বামী ফিরআউন, রাজকীয় শানশওকত, সাজসজ্জা, দাসী-বাঁদি সবকিছু হাসিমুখে আল্লাহর জন্য বিসর্জন দিয়েছেন।

এগুলোর কারণে নারী শ্রেষ্ঠ হয়। নারীর সম্মান এগুলোর কারণে হয়। বড় সিইও হওয়া—এগুলো নারীর সম্মানের না। বরং এগুলো নারীত্বকে শেষ করে দেয়। নারীর যে দায়িত্ব, তার যে গর্ব—সবকিছু শেষ করে দেয়।

এখন ইনডিভিজুয়াল অনেক প্রশ্ন আসতে পারে যে, আমার এই এই অবস্থা, আমি কী করব! এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম, এটা ইসলামের জেনারেল হুকুম। এটা আমাদের টার্গেট, আমরা এখানে উঠতে চাই। কিন্তু প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন। কারও পারিবারিক চাপ থাকে। কেউ দেখা যাচ্ছে, বাবা-মায়ের বড় মেয়ে। তিন মেয়ের মধ্যে সে বড়। এখন স্বাভাবিকভাবে তাকে আয়রোজগার করতে হবে। হয়তো পরের দুইবোনের বিয়েশাদি তাকেই দিতে হবে। বা দেখা গেছে, কারও বাবা নেই। তার এখন পরিবারকে দেখতে হচ্ছে। পরিবার তার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। আবার দেখা গেছে কারও পারিবারিক চাপ রয়েছে, ছোটবেলা থেকে ভালো ছাত্রী, বাবা-মায়ের ইচ্ছে,

মেয়ে ডাক্তার হবে। খুব কষ্টের বিষয়, মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা রিসার্চ হয়েছে, এরমধ্যে ১৭% মেডিকেল ফিমেল স্টুডেন্ট বলছে, তারা মেডিকেল পড়তে এসেছে বিয়ের জন্য। ভালো বিয়ে হবে, এই কারণে।[১৪৬]

বিষয়টা হচ্ছে এমন যে, এরকম অনেকেই আছেন, তারা কী করবেন? বা অনেকে আছেন, বাড়িতে আয়ের কেউ নেই। বা বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা, তিনি তার সংসারটা কীভাবে চালাবেন। বা তার স্বামী অক্ষম হয়ে পড়েছে, দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ, সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদেরকে চাকরি করতে হচ্ছে।

আবার একই জিনিস ছেলেদের ক্ষেত্রেও। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা আছে, ছেলেদের ক্ষেত্রেও সমস্যা থাকতে পারে। যেমন, ফ্রি-মিক্সিংয়ের কারণে ভার্সিটিতে পড়তে চায় না। আলেম হতে চায়। এখন কথা হচ্ছে, যদি আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, তাহলে আমার সাজেশন হচ্ছে, আপনি সেখানে পড়া ছেড়ে দিতে পারেন। এটাই তাকওয়ার বেশি নিকটবর্তী। যদি সুযোগ থাকে, বাবা-মায়ের কোনো আপত্তি না থাকে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, আপনাকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে বাবা-মায়ের সঙ্গে, তাহলে আপনি যুদ্ধটা করবেন না। নিজের জীবনটা কঠিন করবেন না। নিজেকে পরীক্ষায় ফেলবেন না। পরিস্থিতি বুঝে এগোতে হবে। হ্যাঁ, **যদি সুযোগ থাকে, তাহলে সুযোগ ব্যবহার করুন। এই কলুষিত দুনিয়া থেকে সরে যান। ইলম শিখুন, বা অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো শিখে নিজেকে প্রস্তুত করুন।** কিন্তু যদি আপনি না পারেন, প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন; তাহলে এই বিষয়গুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন নেই।

এক ভাই সহশিক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছেন, সহশিক্ষার ব্যাপারে আলেমরা বলেন, **পুরুষরা হচ্ছে বাই ডিফল্ট বহির্মুখী। তারা বাইরে পড়াশোনা করবে, বাইরে কাজ করবে। এখন ভার্সিটি-মেডিকেল কলেজের যে ফুল সেটআপ, এই সেটআপটা বেসিক্যালি পুরুষদের জন্যই। মেয়েরা আলাদা ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী।** তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে, যেটা আমাদের বর্তমান সেক্যুলার রাষ্ট্র করবে না। যেহেতু এটা মেয়েদের জায়গা না, বেসিক্যালি বাই ডিফল্ট ছেলেদের জায়গা, তাই সহশিক্ষাটা ছেলেদের জন্য ওভাবে

---

[১৪৬] ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে অনলাইন মেডিকেল জার্নাল *PLOS ONE*-এ প্রকাশিত গবেষণায় এমবিবিএস শেষ বর্ষের সরকারি মেডিকেলের ২০৭ জন ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ১০৭ জন ছাত্রীর ওপর জরিপ করা হয়। **জরিপে অংশ নেওয়া ছাত্রীদের ১৭ শতাংশ বলেছিলেন, বিয়ের বাজারে এই পেশার দাম আছে।**

নাজায়েজ না, যেভাবে মেয়েদের জন্য নাজায়েজ।

একটা বিষয় লক্ষ করতে হবে, আলেমরা ব্যাপারটাকে জায়েজ বলতে পারবেন না, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এখনকার যে অবস্থা, ইসলামের ইতিহাসে এরকম অবস্থা কখনোই ছিল না। **এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আলেমরা না পারছেন ইসলামের মূল বক্তব্য থেকে সরে এসে আপনাকে জায়েজ বলতে। আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ও তারা নেই যে, তারা মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেবেন।** বা তারা সহজেই একটা কারিকুলাম বানিয়ে ফেলবেন। বা তারা সহসাই মেয়েদের জন্য আলাদা একটা মেডিকেল কলেজ তৈরি করবেন। সে সামর্থ্যও তারা রাখেন না।

সুতরাং আলেমরা পড়ে গেছেন দোটানায়। তারা না পারছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে কৃত ওয়াদার বিরুদ্ধে যেতে; আর না পারছেন আমাদের বোনদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, আলাদা মার্কেট-শপিংমল, আলাদা পরিবহন, তাদের জন্য আলাদা মেডিকেল কলেজ, আলাদা হাসপাতাল—সবকিছু তাদের উপযোগী করতে। সুতরাং আপনারা আলেমদেরকে জোর করবেন না। তাদের ভুল বুঝবেন না। কিছু 'উস্তাযা' আছেন, তারা বিভিন্ন জায়গায় আলেমদের ব্যাপারে ভুলভাল কথা বলেন। তারা বলেন যে, আলেমরা পুরুষতান্ত্রিক, আলেমরা নারীবিদ্বেষী। এগুলো খুব অগভীর চিন্তা। বরং আমাদের আলেমরা মাজুর। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটার বিরুদ্ধেও যেতে পারছেন না। আবার তারা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী যে ব্যবস্থা, সেটাও করতে পারছেন না, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না থাকার কারণে। তারা নিজেরাই মজলুম, কোনোরকম পালিয়ে বেঁচে আছেন। জেল, জুলুম, অত্যাচার, নিপীড়নের শিকার হয়ে ইসলামটুকু ধরে রেখেছেন ২৫০ বছর ধরে, সেই ইংরেজদের যুগ হতে।

এই পয়েন্টটা সবাইকে বুঝতে হবে। বোনদেরও বুঝতে হবে, ভাইদেরও বুঝতে হবে। এর জন্য আলেমদেরকে ভুল বুঝবেন না যে, তারা সেই আদিযুগে পড়ে আছে, মেয়েদেরকে তারা আটকে রাখতে চায়, নারীবিদ্বেষী ইত্যাদি। **আমরা কি আমাদের মায়েদের প্রতি বিদ্বেষী হতে পারি? আমাদের স্ত্রীদের প্রতি, বোনদের প্রতি, কন্যাদের প্রতি বিদ্বেষ থাকতে পারে?** এটা হলো কিছু? পরিস্থিতি অনুকূল না। পরিস্থিতি অনুকূল হলে আবার সব হবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলামের জেনারেল হুকুম আমি আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম। এখন

আপনারা এটা কতটুকু মানবেন, কতটুকু মানবেন না, সেটা আপনাদের বিষয়। যে কাজটাই করুন, আলেমদের সাথে পরামর্শ করে করুন।

সহশিক্ষা নাজায়েজ, এটা হচ্ছে ফতওয়া। কিন্তু এই নাজায়েজ পর্যন্ত আপনি কীভাবে পৌঁছাবেন, এটা আমার ক্ষেত্রে একরকম হবে, আপনার ক্ষেত্রে আরেকরকম হবে। এটা আপনি যখন কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করবেন, সেই আলেম আপনার বাবা-মায়ের মানসিকতা কেমন, আপনার পারিবারিক অবস্থা কেমন—সবকিছু বুঝেশুনে আপনাকে একটা রাস্তা বাতলে দেবেন। যে রাস্তা অনুসারে চলে আপনি ওই ফতওয়া পর্যন্ত পৌঁছাবেন।

ফতওয়া তো সবার জন্যই এক। কিন্তু এই ফতওয়া পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তাটা একেকজনের একেকরকম হতে পারে। পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে। অবস্থা অনুসারে। এটা বলে দেবেন যখন আমি কোনো বয়েসী আলেমের সাথে পরামর্শ করব। এভাবে চললে ওই ফতওয়া পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। এইজন্য যেকোনো একজন আলেমের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। মাঝেমধ্যে বাসায় দাওয়াত করা, মাঝেমধ্যে গিফট দেওয়া, বিভিন্ন সময়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী চলা। এরকম একটা সম্পর্ক তার সাথে স্থাপন করতে হবে।

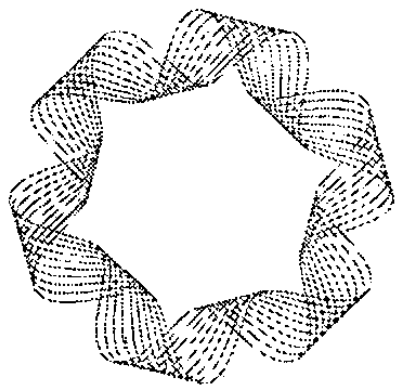

পড়তে যেহেতু হচ্ছেই

আমার কথা হচ্ছে, যদি আমাকে পড়াশোনা করতেই হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা ভালো করে পড়াশোনা করব। যেহেতু আমাকে পড়াশোনা করতেই হচ্ছে, আমি মেয়ে হই বা পুরুষ হই, যদি জেনারেল লাইনে আপনাকে পড়াশোনা করতেই হয়, সিরিয়াস হোন, খুব ভালোভাবে করুন।

১.

প্রথমত ভার্সিটি কালচার বাদ দিয়ে, ঘাড় গুঁজে ৫-৬ ঘণ্টা লেখাপড়া করুন। ছাত্রজীবনে অযথা সময় নষ্ট করবেন না। ভার্সিটির কালচার বলতে, যে ওপেন কালচার, নারী-পুরুষ ফ্রি-মিক্সিং, এই পার্টি ওই পার্টি, মুক্তমঞ্চ, আড্ডাবাজি, গ্রুপস্টাডি হেনতেন। এই কালচার বাদ দিতে হবে। **এমনভাবে পড়বেন, যেন নাজায়েজ জিনিসগুলোর দিকে খেয়ালের সময়টুকু না হয়ে ওঠে।**

২.

সিজিপিএ-র সাথে কোনো আপস নেই। সিজিপিএ কখনো কমা যাবে না। এটা হচ্ছে, যদি আপনি পড়তে বাধ্য হন, তখন। যদি বাধ্য না হন, তাহলে ছেড়ে দিন। আর বাধ্য হলে, ভালো করে পড়ুন। **সিজিপিএ-র সাথে কোনো আপস করবেন না, সর্বোচ্চ সিজিপিএ যেন থাকে।** কারণ, আপনি যদি না পড়েন, তাহলে আপনি অন্যান্য ফালতু জিনিসের দিকে মোড় নেবেন।

৩.

সাজেশানের বাইরেও পড়ুন। **এমনভাবে পড়বেন, যেন স্যার আপনার থেকে শিখতে পারে।** কথার কথা, আপনাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়তে হচ্ছে, আপনি গ্রিক নগর-রাষ্ট্র নিয়ে পড়াশোনা করছেন। তো, আপনাকে যে বইটা

দেখিয়ে দেবে, শুধু ওইটাই পড়বেন, তা না। বরং আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিয়ে, আরও দশটি ইউটিউবে ভিডিও দেখুন। আরও দশটা আর্টিকেল আপনি খুঁজে বের করে পড়ুন। এবং একটি নোট তৈরি করুন। পরে স্যার যখন জিজ্ঞেস করবেন, বা পরীক্ষায় আসবে, তখন আপনি সেখান থেকে উত্তরটা দেবেন, বা, খাতায় লিখবেন।

৪.

নিজ সাবজেক্টের সাথে সম্পর্কিত ইসলামি চিন্তাধারা স্টাডি করুন। আমার ছোটবোন একটা মহিলা কলেজে ইন্টারে পড়ে, তো, ওর পৌরনীতি বইটা আমি নিয়েছিলাম, দেখলাম সেখানে লেখা আছে রোমান সাম্রাজ্যের কিছু দার্শনিক কথাবার্তা, আলোচনা। এরপর চলে গেছে একেবারে ইটালির ম্যাকিয়াভেলি, অর্থাৎ, ১৫০০ শতাব্দীতে। মানে, তিন শতক থেকে ১৫০০ শতক, অর্থাৎ, মাঝখানে ১২০০ বছর পুরো বাদ দিয়ে দিয়েছে। তো, এই ১২০০ বছর সম্পর্কে বলছে, এই মাঝখানে ১২০০ বছরের সময়টাতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে কোনো কাজ হয়নি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে যে কাজগুলো হয়েছে, তা ধর্মের প্রেক্ষিতে হয়েছে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এগুলোকে স্বীকৃতি দেয় না।

আরে নির্বোধের দল! এই যে ১২০০ বছর, ইসলাম আসার পরে এ সময়ে সবচেয়ে সফলতম রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে। সফলতম রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলাম তৈরি করেছে। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন গরিব মানুষ ছিল না। জাকাত নেওয়ার মতো লোক পাওয়া যায়নি বছরের পর বছর। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় একজন মেয়ে ১২০০ কিলোমিটার রাস্তা একা সফর করে আসে, তার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকায়নি। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বয়ং খলিফাকে বাদীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফা নিজে তার ছেলেকে মদ পান করার কারণে শাস্তি দেয়। এরকম একটি সফলতম রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ে তারা বলছে, এখানে রাষ্ট্র নিয়ে কোনো কাজ হয়নি!

এরমানে, আপনি যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়েন, তাহলে এই এই সময়টাতে ইসলাম কী কাজ করেছে, এটা আপনার জানা থাকা লাগবে। ইমাম মাওয়ারদির (৩৬৪-৪৫০ হিজরি) *আহকামুস সুলতান* পড়তে হবে। ইবনে খালদুন (৭৩২-৮০৮ হিজরি) পড়তে হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহিমাহুল্লাহর *সিয়ারে কাবির*, *সিয়ারে সগির* পড়তে হবে।

মোটকথা, আপনার নিজ সাবজেক্টের সাথে ইসলামি চিন্তাধারা কী, সেটা আপনি স্টাডি করুন। করে তুলনা করুন। দুটো তুলনা করে, আপনি ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লেখালেখি করুন। যেমন, আমি ইসলামি আইন পড়েছি, ব্রিটিশ কমন ল পড়েছি। আমি দেখেছি যে, এই বিষয়ে ইসলামি আইনটাই বেশি পারফেক্ট। এগুলো নিয়ে আপনি লেখালেখি করবেন। এটি আপনার দাওয়াহর কাজ। পড়তে যেহেতু হচ্ছেই, ভালো করে পড়ালেখা করুন।

৫.

১ম বর্ষে 'রিসার্চ মেথডোলজি' সম্পর্কে জানুন। গবেষণামুখী হোন। রিসার্চ করার একটা মেথড আছে, পশ্চিমারা সেটা তৈরি করেছে। এটার সম্পর্কে আপনারা জানার চেষ্টা করুন। আমাদের ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে, 'গবেষক হতে চাই'। এই গ্রুপটাতে যদি থাকেন, অনেককিছু জানতে পারবেন। ফার্স্ট ইয়ারে থাকাবস্থায় রিসার্চ মেথডোলজি সম্পর্কে জানুন। এবং এই মেথড অনুসরণ করে নিজেরা ছোট ছোট রিসার্চ করতে থাকুন। আর ইসলামের পক্ষে জ্ঞান তৈরি করুন।

৬.

দাওয়াহ করুন। নিজের ক্যাম্পাসে দাওয়াতের কাজ করুন। আপনি ঢাকা ভার্সিটিতে পড়েন। তো, এই যে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ার যে একটা ট্যাগ, এই ট্যাগকে কাজে লাগিয়ে আপনি আপনার নিজ এলাকায় মেহনত করুন, নিজের সাবেক ক্যাম্পাসে (স্কুলকলেজে) কাজ করুন। যেমন আমি মেডিকেলে পড়ছি। আমার কাছে তেমন কিছু মনে হয়নি। কিন্তু আমার গ্রামে যখন যাই, সবাই আমাকে ডাক্তার ভাবে। আমি যখন কথা বলব, সে কথাটা তারা নেবে। আপনি পাবলিক ভার্সিটির স্টুডেন্ট, বা, আপনি প্রাইভেট ভার্সিটির স্টুডেন্ট। তো, আপনি যখন একটা হাইস্কুলে গিয়ে কথা বলবেন, তখন ওই হাইস্কুলের স্টুডেন্টদের কাছে, আপনি একজন সেলিব্রিটি। কারণ, সে তো আপনার জায়গায় নিজেকে দেখতে চায়। তো তার কাছে গিয়ে আপনি তাকে ইসলামের কথা বলুন। দাওয়াহ করুন।

৭.

আলেমদের সাথে ওঠাবসা করুন। তাদের সাথে ওঠাবসা করলে, আপনি রাস্তা

হারাবেন না। আলেমদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে, তাদের মজলিসে গেলে—রাস্তা হারাবেন না। কারণ, **আমরা হচ্ছি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। আর আলেমগণ হচ্ছেন, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। সুতরাং তাদের সাথে ওঠাবসা করলে পরে, আমি ঠিক রাস্তায় চলতে পারব।** অন্যথায় আমাকে পশ্চিমা দর্শন কোথায় নিয়ে চলে যাবে, ঈমানবিধ্বংসী জায়গায় নিয়ে চলে যাবে—টেরই পাব না।

৮.

ঈমানকে মজবুত করুন। ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার সংঘাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখুন। যেমন, একটু আগে যে আলাপটা করলাম, এই যে একটা সংঘর্ষ, উভয়টা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখা। এটার জন্য কিছু বইপত্র আছে, যেগুলো আপনাকে পড়তে হবে। আসিফ আদনান ভাই ও ইফতেখার সিফাত ভাইয়ের বইগুলো পড়তে হবে। আমার বইগুলোও পড়তে পারেন। রাফান আহমেদ, মুসা আল হাফিজ সাহেবের বইগুলোও পড়া জরুরি। এবং সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদবি রহিমাহুল্লাহর বইগুলো পড়া দরকার। তাহলে, ইসলাম ও পশ্চিমা বিশ্বব্যবস্থার সংঘাত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন।

৯.

নবিজি ও সাহাবিরা যে দ্বীন পালন করেছেন, সেই দ্বীনের সাথে কোনো আপস নেই। আল্লাহর রাসুল যে দ্বীন পালন করে গেছেন। আমি ওই ইসলামের ওপরই ঈমান এনেছি। ওই ইসলামটাই আমার লাগবে। কোনো মডিফাইড, মডারেট, মডার্ন এ ধরনের কোনো ইসলাম আমরা মানি না।

১০.

দ্বীনি কমিউনিটি থেকে দূরে সরে যাবেন না। সবসময় কমিউনিটির মধ্যে থাকবেন। দ্বীনি বোনেরা চার-পাঁচজন মিলে কমিউনিটি তৈরি করে নেবেন। দ্বীনি ভাইয়েরা চার-পাঁচজন, দশজন মিলে কমিউনিটি তৈরি করবেন। তাবলিগে দেখেন না কমিউনিটি আছে। তারা একসাথে তালিম করেন, কেউ যদি একদিন না আসেন, তিনজন তাকে আবার খুঁজতে যান। তো এরকম একটা কমিউনিটি তৈরি করুন। চার-পাঁচজন মিলে একসাথে চলুন। একা একা চলবেন না। একা একা চললে পরে, শয়তান নিয়ে যাবে একদিন।

১১.

ভোগ কমিয়ে প্রোডাক্টিভ হোন। পেশাগত ক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিগত ভোগ কমাবেন। কিন্তু আয় বেশি করতে হবে। কারণ, আল্লাহর রাসুল বলেছেন যে, নেককার মানুষের কাছে যদি হালাল সম্পদ থাকে, এটা দিয়ে সে দ্বীনের পক্ষে কাজ করে। সুতরাং নিজের ব্যক্তিগত ভোগ কমবে, কিন্তু আয় বাড়াতে হবে। প্রোডাক্টিভ হতে হবে।

শিক্ষকতা

ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত পছন্দ হলো, এক নম্বরে শিক্ষকতা। সেটা যেখানেই হোক। কিন্ডারগার্টেন হতে পারে, হাইস্কুল হতে পারে, প্রাইমারিও হতে পারে, কলেজ হতে পারে। আমি নিজেও মেডিকেল কলেজের শিক্ষক হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। কারণ, আপনি যখন শিক্ষক হবেন, আপনি দাওয়াহ করার জন্য কিছু ছাত্রছাত্রী পাবেন। যাদেরকে আপনি আপনার মতো করে, ইসলামের পক্ষে শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন। **শিক্ষকতা পেশা দাওয়াহর বিরাট সুযোগ।** মুমিনের ক্যারিয়ার হবে, না টাকার জন্য আর না সম্মানের জন্য। মুমিনের ক্যারিয়ার হবে এক নম্বরে দাওয়াহ, দুই নম্বরে হচ্ছে, সাদাকাহ।

সুতরাং শিক্ষকতা পেশা একটা দাওয়াহ। এজন্য সবসময় চেষ্টা থাকা দরকার যে, আমি যেন শিক্ষকতা পেশায় ঢুকতে পারি। সেটা যেখানেই হোক। কোনো শিক্ষকতাকে ছোট মনে করবেন না। প্রাইমারি স্কুলে বেতন কম বলে ভাবছেন? বেতন তো আল্লাহ তাআলা থেকে আসে। কিন্তু আমাকে খুঁজতে হবে দাওয়াহর কাজ। আমি চল্লিশটা বাচ্চাকে ইসলামের সৈনিক করে বড় করতে পারছি। এটা একটা বিরাট ব্যাপার।

গবেষণা

প্রত্যেকের নিজ নিজ ফিল্ডে গবেষণা করা দরকার। আসুন, আমরা একটি উদাহরণ দিই, গবেষণা কীভাবে ইসলামের পক্ষে কাজ করে : ঢাকা ভার্সিটিতে একজন বামপন্থী প্রফেসর আছেন; মোহাম্মদ আজম। তার গবেষণা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় মূলত প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দ ছিল। যে শব্দগুলোকে ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবে, হিন্দুদের মাধ্যমে বের করে দিয়েছে। এর পরিবর্তে সেখানে

সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়েছে। অর্থাৎ, আমরা এখন যে বাংলা ব্যবহার করি। প্রমিত বাংলা, কলকাতায়ি বাংলা। এই বাংলাকে তারা সংস্কৃত দিয়ে মূল ভাষা হিসেবে তৈরি করেছে। অর্গানিক যে বাংলা ভাষা, সেটা এরকম ছিল না। সেখানে প্রচুর আরবি, প্রচুর ফারসি শব্দ ছিল। যে বাংলাটা আমরা শুনলে, হয়তো এখন বুঝতেই পারব না যে, এটা বাংলা। তো, আমরা যারা ইসলামের পক্ষে কাজ করছি। আমরা কি সেই গবেষণাটাকে ব্যবহার করছি না? এটা আমাদের পক্ষে গিয়েছে না? এর মানে, গবেষণা করে এমন জিনিস জানা যায়, যে জিনিসটা ইসলামের পক্ষে আমরা অ্যাক্টিভিস্টরা ব্যবহার করতে পারি। অ্যাকাডেমিশিয়ানরা এমন জিনিসটা গবেষণা করে দেবেন আমাদেরকে, যেন আমরা অ্যাক্টিভিস্টরা সেগুলো নিয়ে অ্যাক্টিভিটি করতে পারি।

যেমন, আরেকজন আছেন, হাসান মাহমুদ ভাই, 'বাঙালি মুসলমান প্রশ্ন' নামে তার একটি বই আছে। ওই বইতে দেখিয়েছেন, হিন্দুরা যেমন দাবি করে যে : আমরা মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলাম। সুতরাং আমাদেরকে আবার হিন্দু হতে হবে। তাহলে আমরা আসল বাঙালি হব। তিনি দেখিয়েছেন যে : না! আমরা কখনোই নিম্নবর্ণের হিন্দু ছিলাম না। বরং যারা বাংলাদেশের বাঙালি, তারা হচ্ছে বাইরে থেকে আসা মুসলমান। এবং এই এলাকায় যে-সমস্ত অ-হিন্দু জনগোষ্ঠী কাজ করত, তারা। তার মানে আমরা হিন্দু না। এবং হিন্দু হওয়ার গরজ আমাদের নেই। আর তাদের যে কলকাতায়ি বাঙালি কালচার, সেই কালচার মানার গরজও আমাদের নেই।

বাংলা শব্দটা এসেছে বঙ্গ+আল=বাঙ্গাল থেকে; সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ এই 'বাংলাদেশ'টাকে একত্র করেন আর নিজের উপাধি নেন শাহ-ই-বাঙ্গালাহ। আর বাঙালি শব্দটা এসেছে এই 'বাঙ্গালাহ' থেকে। মুসলমানরা এই 'বঙ্গ' শব্দটিকে 'বাঙ্গালা' বানিয়েছে। 'বাঙালি কালচার'-এর শুরু তো সেখান থেকে, যখন 'বাঙ্গালা' শব্দটা এসেছে। সুতরাং শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ-এর সময় থেকে যেহেতু 'বাঙ্গালা' শব্দের উৎপত্তি, তাহলে বাঙালি কালচার হচ্ছে, সেই সময়কার কালচার। এটা মুসলিম কালচার। বাঙালি কালচারের নামে যদি কেউ আমাদের কলকাতা খাওয়াতে চায়। আমরা সেটা খাব না। কারণ, সেটা হচ্ছে হিন্দুয়ানি কালচার। আমরা কোনোদিন হিন্দু ছিলামও না। এগুলো আমাদের কালচারও না। আমরা আগাগোড়াই মুসলমান এবং নামাজ, দাড়ি, টুপি, বোরকা এগুলোই আমাদের কালচার। তাহলে দেখুন, এই যে একটা

জিনিস আমরা ইসলামপন্থীরা ব্যবহার করছি, এটা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন হাসান মাহমুদ ভাই। তিনি হয়তো দাড়ি রাখেন না। বা তিনি হয়তো ইসলামপন্থীও না, সেক্যুলার। বাকি গবেষণাগুলোকে এভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এইজন্যই বেশি বেশি গবেষণা করা দরকার। **প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ফিল্ডে গবেষণা করা দরকার।**

যে পেশায় থাকুন না কেন, শ্রেষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করুন

যেমন, আমি যেকোনো ফিল্ডে একজন ইনজিনিয়ার। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ইনজিনিয়ার ওই ফিল্ডে বাংলাদেশে আর কেউ নেই। আমি হব সবচেয়ে দক্ষ। শ্রেষ্ঠ ইনজিনিয়ার হবে, একজন দাড়িওয়ালা বা পাগড়িওয়ালা মানুষ। এখানে একটা বিরাট ইফেক্ট আছে। যেমন, শ্রেষ্ঠ কার্ডিওথোরাসিক সার্জন হলেন ডাক্তার এস. আর. খান। দাড়ি-টুপি, জুব্বা ও পাগড়িওয়ালা মানুষ। এমনইভাবে শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের স্থানে আপনি হলেন, একজন দাড়ি-টুপি ও পাঞ্জাবিওয়ালা মানুষ। এর একটা বিরাট প্রভাব আছে। শুধু আপনার চেহারাটাও একটা দাওয়াহ।

নিজের পেশায় দক্ষ হওয়ার চেষ্টা করুন। যেন সেক্যুলাররা আপনাকে আপনার শর্ত মেনেই চাকরি দিতে বাধ্য হয়। বেস্ট গ্রাফিক ডিজাইনার কে? অমুক দ্বীনি ভাই। এই এলাকায় বেস্ট টিউটর কে? অমুক দ্বীনি ভাই। বেস্ট ফ্রিল্যান্সার কে? অমুক দ্বীনি ভাই। **যেটা করছেন, বেস্ট হোন। আর দশজন ইসলাম-মনাকে স্কিলটা শেখান।** আপনার রিজিক থেকে কেউ নেবে না, তার রিজিকটাই সে নেবে।

ডিগ্রির আশায় না থেকে 'ক্যারিয়ার ক্যাপিটাল' তৈরি করুন। ভার্সিটির দীর্ঘসূত্রী পড়াশোনার ফাঁকে সাবজেক্ট রিলেটেড ব্যবহারিক স্কিলগুলো শিখে ফেলুন। যেমন যে বিবিএ পড়ছেন, নিচের জিনিসগুলো নিয়ে অফলাইন-অনলাইন কোর্স করে সার্টিফিকেট নিয়ে ফেলুন :

- ইংলিশ রাইটিং-স্পোকেন
- বেসিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং
- টিম ম্যানেজমেন্ট

- কাস্টমার সার্ভিসের মৌলিক নিয়মকানুন
- সেলিংস্কিল

বিনাবেতনে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে কিছুদিন কাজ করে সার্টিফিকেট নিয়ে নিন। **প্রশিক্ষণের সামান্য সুযোগও লুফে নিন। প্রতি ৬ মাসে আপনার সিভিতে যেন একটা স্কিল যোগ হয়, সেই ব্যবস্থা করুন।** চাকরির সেক্টর এখন শুধু ডিগ্রি দিয়ে হয় না, অভিজ্ঞতা চায়। আপনার বন্ধুদের সিভিতে যখন শুধু ডিগ্রিটা থাকবে, তখন আপনার সিভিতে থাকবে ডিগ্রির সাথে বহু অভিজ্ঞতার সনদ। আপনার ক্যারিয়ার ক্যাপিটালে থাকবে বহু প্রশিক্ষণ, কোম্পানির সিস্টেমের সাথে ওঠাবসার স্বীকৃতি।

অফিস-প্রধান হওয়ার চেষ্টা থাকবে

আপনার পেশায় যে আপনি বেস্ট, এটাই একটা দাওয়াহ। এবং যেখানেই আপনি চাকরি করবেন, আপনি প্রমোশন পেয়ে পেয়ে অফিসপ্রধান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। **ইসলামি নীতি-আদর্শ বিসর্জন না দিয়ে যতটুকু সম্ভব।**

কল্পনা করুন, **সেক্যুলার কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গাগুলো আমাদের থাকলে কেমন হতো।** আমার কাছে রাজশাহী ভার্সিটির একটা ছেলে এসেছে, এসে বলছে, ভাই, আমাদের যিনি প্রফেসর, তিনি আমাদেরকে ক্লাসের সময় বিভিন্ন নাস্তিকতা ও দর্শনের কথাবার্তা বলেন। এবং নাস্তিকতার দাওয়াত দেন। আমি তখন তাকে বললাম, তুমি একটু কল্পনা করো তো। তুমি যদি প্রফেসরের জায়গায় থাকতে, তাহলে তুমি কী ক্লাস নিতে? সে বলল, হ্যাঁ, ভাইয়া; আমি তখন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বগুলো ইনিয়েবিনিয়ে বিভিন্নভাবে বোঝানোর চেষ্টা করতাম। বললাম, তাহলে তুমি আমাকে বলো, কেন ঠিকমতো পড়াশোনা করো না। কেন তুমি ওই প্রফেসরের জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করো না।

অবশ্যই করতে হবে। সুতরাং নিজের পেশায় শ্রেষ্ঠ হতে হবে। এবং অফিসের প্রধান হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, **আপনার অফিসের প্রধান একজন হিন্দু, বা, একজন উগ্র-সেক্যুলার হলে তো সমস্যা হয়ে যাবে। বরং এই জায়গায় যদি আপনি যেতে পারেন। তাহলে পুরো অফিসে ইসলামি পরিবেশ তৈরি করতে পারবেন কিছুটা হলেও।** না পারলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, যার সুফল অন্য মুসলিম কর্মচারী ভোগ করবে।

ক্যারিয়ারের ব্যাপারে আলেমগণের পরামর্শ

যেমন, আপনি দুই-তিনটা জায়গায় সিভি জমা দিয়েছেন, একটা বা দুইটা জায়গায় হয়ে গেছে। তো তখন ওইটার ব্যাপারে একজন বয়স্ক আলেমের সাথে পরামর্শ করবেন। যে, আমি এখন কী করব। আলেমদের সাথে থাকলে, দ্বীনি কমিউনিটির সাথে ওঠাবসা করলে আশা করি কখনো পথ হারাবেন না। আপনাকে বাঘে টেনে নেবে না। একেলা বকরিটাকেই বাঘে খায়, আর মানুষের বাঘ হলো শয়তান।[১৪৭]

ইসতেখারা করা

ইসতেখারার মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে ইশারা নিতে হবে : কাজটি আমার জন্য ভালো হবে, নাকি খারাপ হবে। ইসতেখারার দুআটা মুখস্থ করে রোজ ইসতেখারার অভ্যাস করতে হবে।

ইসতেখারার দুআ

اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فضلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُ، وأَنْتَ عَلامُ الغُيوب، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذا الأمر - ويسمي الشيء الذي يريده- خَيرُ لي في ديني ومَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْري عَاجِلهِ وآجِلِهِ فاقْدُرْهُ لي ويَسَرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فيه، وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرُّ لي في دِيني ومَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمري عَاجِلِهِ وآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কল্যাণ চাই –আপনার ইলমের সাহায্যে। আপনার কাছে শক্তি কামনা করি আপনার কুদরতের সাহায্যে।

আপনার কাছে অনুগ্রহ চাই আপনার মহা অনুগ্রহ থেকে। আপনি সর্বোময় ক্ষমতার অধিকারী – আমার কোন ক্ষমতা নাই আপনি সর্বজ্ঞ – আমি কিছুই জানি না। আপনি সকল গোপন বিষয় পূর্ণ অবগত। পক্ষান্তরে আপনার ইলমে এ কাজ যদি আমার দ্বীন আমার জীবন-জিবীকা ও

---

[১৪৭] মুসনাদে আহমাদ : ২২১০৭, হাসান লিগাইরিহি।

"হে আল্লাহ, আপনার ইলমে এ কাজ আমার দ্বীন আমার জীবন-জিবীকা ও কর্মফলের দিক থেকে অথবা বলেছিলেন, দুনিয়া ও পরকালের দিক থেকে মন্দ হয়) তবে তা আমাকে করার শক্তি দান করুন।

কর্মফলের দিক থেকে তবে আমার ধ্যান-কল্পনা একাজ থেকে ফিরিয়ে নিন। তার খেয়াল আমার অন্তর থেকে দূরীভূত করে দিন।

আর আমার জন্যে যেখানেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে এর ফায়সালা করে দিন এবং আমাকে এরই উপর সন্তুষ্ট করে দিন (বুখারী)

ব্যবসা করা শিখুন ছাত্রবয়সে

ব্যবসা নিয়ে আলাপ আগে করেছি। মুসলিমদের ব্যবসায় আসা জরুরি।

- দ্বীনি ভাইদেরকে বলব, আপনারা ব্যবসা করুন। ছাত্রবয়সেই ব্যবসায় অভ্যস্ত হোন। বিজনেস-মাইন্ড তৈরি করুন। ছোট ছোট ইনভেস্ট করে লাভ করার চেষ্টা, মানুষের চাহিদা খোঁজা, সস্তায় সেই চাহিদাপূরণের পণ্য/সেবা খোঁজা, কাস্টমার স্যাটিসফেকশনের পলিসি খোঁজা, নিজের মার্কেটিং শেখা।

- বোনদেরও বলব, আপনারা ব্যবসা করুন আর না করুন, ব্যবসাটা শিখে রাখবেন। কীভাবে ব্যবসা করতে হয়, এটা স্বামীর কাছ থেকে বা ভাইয়ের কাছ থেকে, বা বাবার কাছ থেকে, বা যারা ব্যবসায়ী আছেন, তাদের কাছ থেকে—ব্যবসাটা শিখে নেওয়া জরুরি। আল্লাহ না করুন, একটা সময় এমন হতে পারে যে, আপনার নিজের ইনকাম নিজেকেই করতে হচ্ছে।

শেষ কথা

দ্বীনে ফেরার পরই আমরা সবার আগে যে জিনিসটা বুঝি সেটা হলো : এতদিন আমি দুনিয়া নিয়ে আখেরাত ভুলে ছিলাম। এখন 'সেগুলো ছেড়ে' আমাকে দ্বীন নিয়ে চলতে হবে। পার্থিব জিনিস এবং ধর্মীয় জিনিস। যেন দুনিয়া ও দ্বীন পরস্পর বিপরীত শব্দ। যেন ধর্ম করলে পৃথিবী ছেড়ে দিতে হবে। সরি-টু-সে, আপনি যেটা বুঝলেন সেটা ইসলাম না, সেটা খ্রিষ্টবাদ। **দুনিয়ার কাজ আর দ্বীনের কাজকে আলাদা করা— এটাকেই সেক্যুলারিজম বলে। ইসলামে কোনো দুনিয়ার কাজ, আখেরাতের কাজ বলে কিছু নেই। ইসলামে প্রতিটি কাজই আখেরাতের কাজ, প্রতিটি কাজই দ্বীনি কাজ।** আপনার পেশাব-পায়খানা, স্ত্রীসহবাস, ঘুম, গোসল থেকে নিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনা ও যুদ্ধ করা—সবই ইসলামের আমল। কাজ ভাগাভাগিতে (দ্বীনের কাজ-দুনিয়ার কাজ) ইসলাম বিশ্বাসী না। **প্রতিটি কাজই আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো মাপকাঠিতে করবেন, সেটাই আপনার আখেরাতে জমা হবে নেক আমল হিসেবে।** বোঝা গেল না, তাই তো? আচ্ছা।

সহবাস একটি আমল

বিবাহবহির্ভূত যৌনসংগম যেমন গুনাহের, স্ত্রীসংসর্গ তেমনই সওয়াবের। একবার গরিব সাহাবিরা এলেন :

– ইয়া রাসুলাল্লাহ, ধনীরাই তো সব নেকি নিয়ে গেল। আমরা সালাত পড়ি, তারাও পড়ে। আমরা রোজা রাখি, তারাও রাখে। কিন্তু তারা সদকা করে, আমরা তো করতে পারি না।

– আল্লাহ তো তোমাদের জন্যও সদকার ব্যবস্থা রেখেছেন। প্রতিবার আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা (তাসবিহ) সদকা, প্রতিবার আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা (তাকবির) সদকা, প্রত্যেকবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা (তাহলিল) সদকা, প্রতিবার আল্লাহর শোকর করা (তাহমিদ) সদকা, সৎকাজে আদেশ করা সদকা, অসৎকাজ

থেকে নিষেধ করাও সদকা, এমনকি প্রত্যেকের যৌনাঙ্গেও রয়েছে সদকা।

– ইয়া রাসুলাল্লাহ! কেউ স্ত্রীর সাথে নিজের কামনা পূরণ করলেও সওয়াব?

– কেন? সেটা হারাম কাজে ব্যবহার করলে কি গুনাহ হতো না?

– জি, তা হতো।

– তাহলে তা হালাল কাজে ব্যবহার করলে তার জন্য নেকি তো হবেই।[১৪৮]

ঘুম একটি আমল

মুসলমানের ঘুমও ইবাদত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যে ব্যক্তি জামাতের সঙ্গে এশার নামাজ আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত (নফল) নামাজ আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করল সে যেন সারা রাত জেগে নামাজ আদায় করল।"[১৪৯]

খাওয়া ইবাদত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

"একজন মুসলিম তার সবকিছুতে সওয়াবের অধিকারী হয়, এমনকি তার মুখে খাবারের যে লোকমা আহরণ করে থাকে তাতেও সে সওয়াব পায়।"[১৫০]

"যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করবে, অতঃপর তা থেকে নিজেকে কিংবা আল্লাহর অন্য যেকোনো মাখলুককে খাওয়াবে বা পরাবে, এর দ্বারাও সে দানের সাওয়াব পাবে।"[১৫১]

পেশাব-পায়খানাও ইবাদত

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

[১৪৮] সহিহ মুসলিম : ১০০৬; সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪১৬৭; মুসনাদু আহমাদ : ২১৪৭৩
[১৪৯] সহিহ মুসলিম : ৬৫৬; সহিহু ইবনি হিব্বান : ২০৬০
[১৫০] মুসনাদু আহমাদ, হাদিস : ১৫৩১; মিশকাতুল মাসাবিহ : ১৭৩৩; হাদিসটির সনদ হাসান
[১৫১] সহিহু ইবনি হিব্বান, হাদিস : ৪২৩৬; আল-মুসতাদরাক, হাকিম : ৭১৭৫; এর সনদ দুর্বল

> "যে ব্যক্তি মলত্যাগ করার সময় কেবলামুখে অথবা কেবলাকে পেছন করে না বসে, তার জন্য এর দরুন একটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং একটি গোনাহ মোচন করে দেওয়া হয়।"[১৫২]

আমরা আগেই দেখলাম সৎভাবে ব্যবসা, আমানতদারির সাথে হালাল চাকরি ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকা তালাশও ফরজে আইন ইবাদত। আল্লাহর আইন অনুযায়ী সমাজ-রাষ্ট্র শাসন করা, নবিজির দেখানো পন্থামতে ইসলামি শাসনের জন্য যুদ্ধ করা সবই ইবাদত। মোদ্দাকথা ২৪ ঘণ্টায় আমরা পার্থিব প্রয়োজনে যা যা করি, তা সবই ইসলামে ইবাদত ও আখেরাতের কাজ। তাহলে দুনিয়াবি কাজ বলে কিছুই রইল না। কেননা যখনই আপনি কোনো কাজকে দুনিয়াবি কাজ মনে করলেন, তখন ওই কাজে আপনি আর ধর্মীয় বিধানের পাত্তা দেবেন না, আলেমদের কথাকে গুরুত্ব দেবেন না। যেমন এখন আমরা জীবিকাকে দুনিয়াবি কাজ মনে করি বলে আলেমদের কথাকে পেশা নির্বাচনে তোয়াক্কা করি না। রাষ্ট্রপরিচালনা, বিচার-আইনে কুরআন-হাদিসের নির্দেশনাকে পাত্তা দিই না। সুতরাং সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা করে করে আমরাও এই জায়গায় এসে দ্বীনি-দুনিয়াবি কাজ ভাগ করে সেক্যুলারিজমকেই বিজয়ী করে দিই।

দ্বীনে ফেরার পর আমাদের মধ্যে বৈরাগী ভাব চলে আসে। পড়াশোনা করে কী হবে, ওটা দুনিয়াবি কাজ। ভালো চাকরি করে কী হবে, ব্যবসা করে কী হবে, ওসব দুনিয়াবি কাজ। ইসলাম আমাদেরকে দুনিয়ামত্ত না হতে শিক্ষা দেয়, দুনিয়াবিরাগী হওয়ার শিক্ষা ইসলাম দেয় না। ইসলাম কাজ করতে এসেছে দুনিয়াতে, দুনিয়াকে বদলানোর কাজ। এর ফল পাওয়া যাবে দুনিয়াতেও, আখেরাতেও। আখেরাতকে টার্গেট করে দুনিয়াকে নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ মুমিনকে দুনিয়াতেও দেবেন। আল্লাহ তাকে উভয় জগতেই প্রবৃদ্ধি দান করবেন :

> যে আখেরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দিই এবং আখেরাতে তার জন্য কোনো অংশই থাকবে না।[১৫৩]

> যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কার কামনা করে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহর নিকট

---

[১৫২] আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ১৩২১; সহিহুত তারগিব : ১৫১; হাদিসটি সহিহ

[১৫৩] সুরা শুরা : ২০

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পুরস্কার আছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১৫৪]

আল্লাহর কাছে দুটোই আছে, আল্লাহ আমাদেরকে দুটোই দিতে চান। শর্ত কী? **শর্ত হলো আখেরাতের নিয়তে কাজ করতে হবে, আল্লাহ-রাসুলের দেখানো রাস্তায়, মনমতো না।** রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> এ জাতিকে সুসংবাদ দাও আলো, উচ্চমর্যাদা, দ্বীন, সাহায্য, জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠার। তবে এ উম্মতের মধ্যে যে-কেউ আখেরাতের কাজ দুনিয়া হাসিলের জন্য করবে, আখেরাতে সে কিছুই পাবে না।[১৫৫]

সুতরাং, মুমিনের টার্গেট, মুমিনের ক্যারিয়ার দুনিয়া প্লাস আখেরাত মিলিয়ে। **দুনিয়ার জীবিকা, দুনিয়ার মিশন, আখেরাতে আমার পজিশন—এই সবগুলো মিলিয়ে আমার ক্যারিয়ার।** জান্নাতেও স্তরবিন্যাস আছে। মর্যাদার তারতম্য আছে। যেমন, হাফেজে কুরআন প্রতি আয়াতে একটা প্রোমোশন পাবে জান্নাতে। সেখানেও আমাকে মর্যাদা অর্জন করে নিতে হবে, এবং সেটা এই দুনিয়াতেই করতে হবে। জান্নাতেও আফসোস হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> "জান্নাতের অধিবাসীগণ দুনিয়ার কোনোকিছুর জন্য আফসোস করবে না। শুধু সেই মুহূর্তগুলোর জন্য আফসোস করবে, যেগুলো আল্লাহর জিকির ছাড়া অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।"[১৫৬]

দুনিয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতার উপযুক্ত তো ওই জান্নাত। কত প্রোমোশন নিয়ে আমি জান্নাতে যেতে পারি, সেই প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর সেটা দুনিয়াতেই করতে হবে। জান্নাতের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ বলছেন,

> "আর এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।"[১৫৭]

> "তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী হয়।"[১৫৮]

---

[১৫৪] সুরা নিসা : ১৩৪

[১৫৫] মুসনাদে আহমাদ : ৫/১৩৪

[১৫৬] সহিহুল জামি : ৫৪৪৫; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২০/৯৩; আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব : ১৩৭৩, হাদিসটি হাসান তথা গ্রহণযোগ্য

[১৫৭] সুরা মুতাফফিফিন : ২৬

[১৫৮] সুরা মুমিনুন : ২৮

> "তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আকাশ ও জমিনের মতো।"[১৫৯]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন,

> "...যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা করতেন এবং সে কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে একে অপরের ওপর আনন্দিত হতেন এবং একে অপরকে অনুপ্রাণিত করতেন। এটিও এক প্রকারের প্রতিযোগিতা।"[১৬০]

এবং গরিব সাহাবিরা প্রায়ই নবিজিকে এসে অভিযোগ জানাতেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ, ধনীরা তো দান-সদকা, মালখরচ করে করে আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন অন্য একটা আমল বলে দিতেন। অর্থাৎ **মুমিন-মুসলিমের হাতে সম্পদ তার মর্যাদা বুলন্দের কারণ, যখন সে সম্পদ আখেরাতকে সামনে নিয়ে আয়-ব্যয় করবে। প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কীসে, তার খোঁজ করবে। প্রতিটি কাজে নবিজির কর্মপদ্ধতি কী ছিল, তা খুঁজে নেবে। নিজে স্বাবলম্বী হওয়া এবং আরও দশজন মুসলিমকে স্বাবলম্বী করার জন্য কাজ করবে।** এভাবেই উম্মাহর মেরুদণ্ড শক্তিশালী হবে। উম্মাহ তো বাইরের কেউ না, আমি-আপনিই উম্মাহ। আমরা শক্তপোক্ত-অমুখাপেক্ষী হওয়া মানে উম্মাহই শক্তিশালী হওয়া।

শেষ মেসেজ হলো, **জায়েজ ক্যারিয়ারের পেছনে আমাদের সময় ব্যয়ও আখেরাতেরই আমল। আমাদের সম্পদও আমাদের আখেরাতের সিঁড়ি।** আমাদের প্রতিযোগিতা দুনিয়ার বস্তু ব্যবহার করে আখেরাত অর্জনের প্রতিযোগিতা। আমাদের ক্যারিয়ার টাকা ও সম্মান নয়। মুমিনের ক্যারিয়ার হবে, 'দাওয়াহ ও সাদাকাহ'।

তবে **পুরো দিন যেন শুধু জীবিকার পেছনেই ব্যয় না হয়।** আমরা পশু না, আমরা আশরাফুল মাখলুকাত, আমরা শেষ নবির উম্মত। পশুর মতো শুধু জীবিকার তালাশে আমাদের সারা দিন, পুরো শক্তি, পুরো জীবন ব্যয় হওয়া

---

[১৫৯] সুরা হাদিদ : ২১

[১৬০] আর-রুহ : ১/২৫১

আমাদের জন্য অপমানজনক।

আপনার দিনের, শক্তির, সময়ের, জীবনের, চিন্তাশক্তির একটা অংশ অবশ্যই মিশনে ব্যয় করতে হবে। মিশন আর জীবিকার মাঝে পার্থক্য হলো : মিশনে দুনিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, জীবিকায় দুনিয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকবে। আর মুসলিম হিসেবে, শেষ উম্মত হিসেবে আমাদের মিশন হলো নবিজির স্বপ্ন পূরণ করা—প্রত্যেক কাঁচাপাকা ঘরে ইসলামকে পৌঁছানোর সিস্টেম ডেভলপ করা। ২৩ বছরের জীবনে তিনি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক যে এক লাখ মডেল মানুষ, হাজার হাজার মডেল পরিবার, শত শত মডেল সমাজ, একটা মডেল অর্থব্যবস্থা, একটা মডেল বিচারব্যবস্থা, একটা মডেল রাষ্ট্র তৈরি করে গেছেন। সেই মডেল কপি হতে হতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকা ঘরেও পৌঁছে যাবে দাওয়াত-জিজিয়া-জিহাদের দ্বারা। দুনিয়ার দোজখ (পুঁজিবাদের জুলুম) এবং পরকালের দোজখ থেকে শেষ বনি আদমটাও বেঁচে যাবে।

এজন্য দাওয়াহকে মিশন হিসেবে নিন। প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে-দোকানে-দোপে-মেসে-ক্যাম্পাসে গিয়ে বোঝান যে, তার সকল সমস্যার কারণ ইসলামকে পাত্তা না দেওয়া, আর সকল সমস্যার সমাধান হলো ইসলামকে জীবনে ফিরিয়ে আনা। ব্যক্তিজীবনে, পরিবারে, সমাজে, বাজারে, রাষ্ট্রে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার মাঝেই সকল অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি। সকল সমস্যা-জটিলতার অবসান।

আমাদের লক্ষ্য হলো সভ্যতার এই সংঘাতে যত বেশিসংখ্যক মানুষকে আপনি ঈমানের তাঁবুতে আনতে পারেন, পশ্চিমা চশমা খুলে ইসলামের চশমা পরিয়ে দিতে পারেন—সেই চেষ্টা করা। ব্রিটিশরা আমাদের যে রুচি বদলে দিয়ে গেছে শিক্ষাপ্রণালির মধ্য দিয়ে, সেটাকে ফিরিয়ে আনা। ডিকলোনাইজেশন অফ ব্রেইন। মগজকে উপনিবেশমুক্ত করাই আমাদের প্রস্তুতি (ইদাদ)। যেভাবে পারেন। যতজনকে পারেন। আমাদের জীবিকা আমাদের শক্তি হোক, পিছুটান নয়।

চেতনা থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

বই	লেখক	বিষয়
স্বপ্নের চেয়েও বড়	মাহমুদ তাশফীন	মোটিভেশন
তাহাজ্জুদ শেষ প্রহরের ডাক	ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া	ইবাদাত
ইকরা বিসমি রাব্বিকা	ড. আয়েয আল কারনী	ইলম শেখার দিকনির্দেশনা
সৌভাগ্যের দুয়ার	ড. আয়েয আল কারনী	আত্মশুদ্ধি
রাজার মত দেখতে	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
শিক্ষিত বালক	মনযূর আহমাদ	শিশু-কিশোর গল্প
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে	ড. সালিহ আল মুনাজ্জিদ	আত্মশুদ্ধি
ইলম অন্বেষণে সফর	ড. সালিহ আল মুনাজ্জিদ	ইলম
মহাবীর সালাহ উদ্দিন আইয়ুবি	কাজি বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ	ইতিহাস
স্মরণীয় মনীষী	জুবাইর আহমদ আশরাফ	জীবনী
ইতিহাস পাঠ : প্রসঙ্গ কথা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস পাঠের দিকনির্দেশনা
সিন্ধু থেকে বঙ্গ	মনযূর আহমাদ	ইতিহাস
মুখতাসার রুকইয়াহ	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	কুরআনি চিকিৎসা
নির্মল জীবন	ইমরান রাইহান	আত্মশুদ্ধি
শাজারাতুদ দুর	নুরুদ্দিন খলিল	ইতিহাস
মাওয়ায়েজে সাহাবা	সালেহ আহমদ শামি	নাসিহা
আকিদার মর্মকথা	সামিরুদ্দিন কাসেমি	ঈমান আকিদা

সালাফদের ইবাদাত	মাহমুদ তাশফীন	ইবাদাত
সকাল সন্ধ্যার যিকির ও দুআ	মুফতি ইবরাহীম হাসান	দুআ ও যিকির
ইলাল কুরআনিল কারীম	তাওসীফ মুসান্না	কুরআন শিক্ষা
মুসলিম জাতির ইতিহাস	ড. সুহাইল তাক্কুশ	ইতিহাস
দ্রোহের তপ্ত লাভা	আলী হাসান উসামা	সংস্কার ও দর্শন
মুরিদপুরের পীর	ইমরান রাইহান	রম্যরচনা
শাকহাব প্রান্তরে	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
বিবাহভাবনা	ওয়াহিদুর রহমান	বিশেষ সংখ্যা
রুকইয়ার আয়াত	আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ	রুকইয়া
আলোর পিদিম	আবদুল্লাহ আল মাসউদ	প্রবন্ধ সংকলন
মুশাজারাতে সাহাবা	ইমরান রাইহান	ইতিহাস ও আকিদা
ইতিহাসের অজানা অধ্যায়	ইমরান রাইহান	ইতিহাস
বুনিয়াদি আকাইদ	মাওলানা বেলাল বিন আলী	আকিদা
লেজেন্ডস অব ইসলাম ২খণ্ড	শায়খ আহমাদ মুসা জিবরীল	ইতিহাস
জীবন গড়ার পাথেয়	মুফতি শামসুদ্দিন জিয়া	আত্মশুদ্ধি
ইতিহাসের আয়নায় ভবিষ্যতের দর্পণে বর্তমান মুসলিম উম্মাহ	ইসরার আহমাদ ইফতেখার সিফাত অনূদিত	ইতিহাস ও দর্শন
মুমিনের ক্যারিয়ার ভাবনা	ডা. শামসুল আরেফীন	মোটিভেশন

পাঠকের পাতা

ডা. শামসুল আরেফীন

ডাক নাম শক্তি। জন্মগ্রহণ করেন ১৯৮৯ সালে। সাদামাটাভাবে জীবন পার করা শামসুল আরেফীন শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করেছেন ক্যাডেট কলেজে। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন।

তার লিখনিতে ইসলামি মতবাদ ও আদর্শ প্রকাশের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, এবং ইসলামের বিরুদ্ধে আসা বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের ইসলামি ব্যাখ্যা ও ইসলামি উপায়ে চলার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিধানও উঠে এসেছে তার বইগুলোতে।

মানুষকে দিনের শেষে সৃষ্টিকর্তার দেয়া সমাধানের পথেই ফিরে আসতে হবে- এ কথাই ফুটে ওঠে তার রচিত বইগুলোতে

কেমন হবে একজন খাঁটি মুমিনের ক্যারিয়ার? কী হবে তার জীবনের লক্ষ?

ক্যারিয়ার মানেই আমরা বুঝি টাকা এবং সম্মান। ক্যারিয়ারের মধ্য দিয়ে মানুষ সম্মান খোঁজে, ক্যারিয়ারের মধ্য দিয়ে মানুষ টাকা খোঁজে। কিন্তু ক্যারিয়ারের মধ্য দিয়ে সম্মান খোঁজা, ক্যারিয়ারের মধ্য দিয়ে টাকা খোঁজা, এটা মুমিনের লক্ষ হতে পারে না। কারণ, মুমিন বিশ্বাস করে, টাকা আসে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। রিজিক আসে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে এবং সম্মানও আসে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। আল্লাহ তাআলা রিজিকেরও মালিক, সম্মানেরও মালিক।

এটা আল্লাহ তাআলা যে কাউকে ক্যারিয়ার ছাড়াই দিতে পারেন, এটা আমাদের বিশ্বাস।

সুতরাং আমাদের ক্যারিয়ারটা হবে অন্যান্য মানুষের চেয়ে আলাদা। একজন মুমিনের ক্যারিয়ার হবে মূলত দুইটা উদ্দেশ্যে, একটা হচ্ছে দাওয়াহ, আরেকটা হচ্ছে, সাদাকাহ। একজন মুমিন উপরে উঠবে, অনেক উপরে উঠবে। একজন মুমিন সম্পদ উপার্জন করবে, অনেক সম্পদ উপার্জন করবে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু তার লক্ষ্য থাকবে দুইটা। একটা হচ্ছে, সদাকাহ করা, এবং দুই নম্বরে হচ্ছে, দাওয়াহ করা। দ্বীনের দাওয়াহ করা। মানুষের কাছে দ্বীনটাকে উপস্থাপন করা।

চেতনা
প্রকাশন